JANAM JANAM
Subodh Kumar Chakraborty
Price Rs. 3·00

জনম জনম

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

ক্লাসিক প্রেস

শ্রীমতী নিভা মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের লেখা

রূপম্ ?

একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

অয়ি অবন্ধনে

তুঙ্গভদ্রা

রম্যাণি বীক্ষ্য :

দক্ষিণ ভারত পর্ব

কালিন্দী পর্ব

রাজস্থান পর্ব

সৌরাষ্ট্র পর্ব

ঈয়ুষ্টে যে পূর্বতরাম্ অপশ্যন্
ব্যুচ্ছন্তীম্ উষসং মর্ত্যাসঃ।
অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাভূদো
তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্ ॥

ঋগ্বেদ, ১।১১৩।১১

Gone are those mortals who beheld the beaming
Dawn in former ages,
We now behold her brightness,
And they are coming who will see her in times to come.

Rig-Veda I. 113-11

নালন্দা। এতদিন ভাবতাম, শুধু এই তিনটি অক্ষরই একটা যুগকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটি মাত্র ধ্বনি একটা যুগের ইতিহাসকে নিঃশব্দে ধারণ করে আছে। কিন্তু নালন্দায় নেমে এ ভুল আমার ভেঙ্গে গেল। এ তো শুধু অক্ষর নয়, ধ্বনিও নয়। এ যে একটা ঐশ্বর্যময় অতীতের অমর ইতিহাস, বিস্মৃতদিনের বিপুল কীর্তির বিরাট স্বাক্ষর। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি ভারতের অন্য রূপ দেখলাম—শান্ত-সমাহিত ধ্যানগম্ভীর মৌনরূপ। প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা আমার চোখের সামনে।

ছোট লাইন বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। দেশলাইয়ের বাক্সর মতো ছোট ছোট গাড়ি। ইংরেজী নাম লাইট রেলওয়ে। বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ে। বড় লাইনের বক্তিয়ারপুর স্টেশন থেকে রাজগীর পর্যন্ত তেত্রিশ মাইল বিস্তৃত। নালন্দা এই লাইনেরই একটি নগণ্য স্টেশন। গাড়ি থেকে নেমে মনে হবে, একটা লেভেল ক্রসিঙের উপর নামলাম, আর স্টেশনটি কোন গেটম্যানের বাড়ি। রাজগীর থেকে যে সরকারী রাস্তা বক্তিয়ারপুর গেছে, তারই উপর স্টেশন। পা প্ল্যাটফর্মে পড়ে না। প্ল্যাটফর্ম নেই। পড়ে এই বড় রাস্তার উপরেই। সেখানে এক্কার মতো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অগণিত। উঠে বসলেই পাকা রাস্তা ধরে টেনে আনবে নালন্দার দরজায়।

বড় গাছের নিচে একটা ছোট চায়ের চালা। সেই চালার নিচে কয়েকজন মেয়েপুরুষ বসেছে চা খেতে। তিব্বতী হতে পারে। সিকিমের লোকও হতে পারে। অদ্ভুত তাদের বেশভূষা। লম্বা ঢিলা আলখাল্লা নয়, পরনে পুরু মোটা কাপড়ের ঘাগরা, গায়ে

জামা, তার উপর ছোট কোট। পুরুষদের মাঝখান থেকে মেয়েদের চিনে নিতে এক মুহূর্ত বেশি সময় লাগে।

রাস্তার বাঁ ধারে এই চালা। তারই পাশ দিয়ে পথ গেছে নালন্দার ভিতর। কিন্তু সোজা যাবার উপায় নেই। টিকিট নিতে হবে। সামনেই বুকিং অফিস। একই টিকিটে জাদুঘরও দেখা যায়। জাদুঘরের রাস্তা ডান হাতে। একটুখানি এগিয়েই প্রশস্ত বাগানবাড়ি। তার ভিতর নালন্দার জাদুঘর।

টিকিট নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। দু ধারে ফুলের বাগান। মাঝখানে পথ। নানা জাতের নানা রঙের মরসুমি ফুলে বাগান আলো হয়ে আছে। প্যান্সি ফ্লক্স, ন্যাস্টার্থিয়াম আছে মাথা নুইয়ে, মাথা উঁচু করে আছে অ্যান্টিরিনাম লাক্স্‌পার আর হলিহক। চন্দ্রমল্লিকা শুকিয়ে যাচ্ছে। মাঘের দুপুরে বুঝি গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আর একবার নালন্দার রূপ দেখলাম। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বিরাট এক ক্ষেত্র। একটা শহর। একদা নালন্দা একটি স্বতন্ত্র শহর ছিল। একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি শহর। তার আইন-কানুন আলাদা, জীবনধারণের সমস্ত রীতিনীতিই আলাদা। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে কোনও মানুষ সেখানে ঢোকবার অধিকার পায় নি। ঘুষ দিয়েও পারে নি, তদ্বির সুপারিশের জোরেও না। আজকের মতো সরকারী উর্দিপরা দরোয়ান সেদিন ফটকে ছিল না। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কথা সবাই ভুলে গেছে। শুধু ইতিহাস ভোলে নি।

আমার পিছনে যারা ছিল, তারা থামলনা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবল না আমার মতো। শুধু সরকারী প্রহরীকে তাদের দু-আনার টিকিট দেখিয়ে সরাসরি ভিতরে চলে গেল। তাদের অনুসরণ করে আমিও গেলাম।

মাঘের সকাল। রোদ তীব্র নয়। গায়ের গরম জামা তখনও

আরাম দিচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখবার আগ্রহ তখনও শেষ হয়ে যায় নি। রাস্তা ছেড়ে একটা উঁচু স্তূপের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে ভিতরের অনেকটা জায়গা দেখা যায়। সেই সাততলা স্তূপটা, আর তার উপর উঠবার বাঁধানো ধাপগুলো। কত মানুষ উঠছে। নামছেও কত। অনেকে ছাদের উপর দাঁড়িয়েও ছবি নিচ্ছে নিচের ধ্বংসস্তূপের।

পায়ের নিচে একটা শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। পায়ের নিচে নয়। নিজের চারিদিকে ছাদহীন যে প্রকোষ্ঠগুলি সারি সারি দেখতে পাচ্ছি, তারই কোনটির ভিতর যেন পদসঞ্চারের শব্দ পেলাম। মৃদু অথচ স্পষ্ট। এ ঘরগুলি নেমে দেখবার মতো বৈচিত্র্যময় নয়। কয়েক সারি ছোট ছোট ঘর বহুদূরবিস্তৃত। সে যুগে হয়তো এগুলো ছাত্রদের আবাস-গৃহ ছিল।

আবার আমি সেই শব্দ পেলাম। এবার আর আমার কান ভুল করল না। ও শব্দ যে ভারি বুট জুতোর নয়, নয় হাতিয়ার চালনার, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। নূপুরের নিক্কণ নয়, নয় কঙ্কণের কিঙ্কিণি। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে নিচে কেউ খাতার পাতা ওল্টাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

এখনও এখানে কেউ বই পড়ে! খাতার পাতা ওল্টায়!

দেহ আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু মনে ভয় এল না। চারিদিকে দিনের আলো ঝলমল করছে। পায়ের নিচে যে প্রকোষ্ঠগুলি, তাতেও নেই অন্ধকার। খানিকটা দূর দিয়ে তীর্থ-যাত্রীর মতো নরনারীর যাতায়াত আছে অব্যাহত। ভয় কিসের! কেন ভয় পাব! শুধু আমার কৌতূহল গেল বেড়ে।

আমি সেখান থেকে সরে যেতে পারলাম না। মনে হল, সেই পাতা ওল্টানোর শব্দ আমাকে টানছে। আমি না গেলে কারও বই পড়া বুঝি অসমাপ্ত থেকে যাবে, বুঝি কেউ আমার জন্যই এখানে অপেক্ষা করে আছে। তা না হলে সোজা পথ ছেড়ে আমি এই

স্তূপের উপর কেন উঠে এলাম। কেন শুনতে পেলাম এই অব্যক্ত আহ্বান! আবার আমার রোমাঞ্চ হল।

ভাঙা দেওয়ালের উপরগুলো বেশ শক্ত। চলতে একটুও কষ্ট হল না। কিন্তু সোজাসুজি নামবার কোন পথ খুঁজে পেলাম না। ভাবলাম ঘুরে এসে নিচে নামব। কিন্তু তার আগেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। ভারি মিষ্টি সুরের গুণগুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বিজাতীয় সুর, ভাষাও বিজাতীয়। এমন ভাষা এমন সুর আমি আগে কখনও শুনি নি। আমি উৎকর্ণ হয়ে সেই গান শুনলাম।

তা মা জিতার ছ্যুঙ্ ক্যঙ্

কোন ছোগ দাম-পেঅ জীগ ইয়োঙ্।

শুধু একটিমাত্র চরণ একবার মাত্র গাইল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।

আমি পাশের দেওয়ালের উপর সরে এসে দাঁড়ালাম। এক মুহূর্তে আমার চোখ-কানের বিবাদ একসঙ্গে মিটে গেল। একটা ছোট ঘরের দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে একটি তিব্বতী মেয়ে কী সব লিখে নিচ্ছে তার খাতার পাতায়। উপর থেকে অক্ষরগুলো আমি দেখতে পেলাম না, শুধু ছবির মতো আঁচড় বলে মনে হল। খস খস করে লিখছে না, ধীরে ধীরে আঁকছে। দেওয়ালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর আঁকছে। একসময় দেখলাম, ডান হাতের পেন্সিলটা পকেটে রেখে বিবর্ধন কাচ একখানা বার করল। দেওয়ালের গায়ে কী পরীক্ষা করল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর কাচ রেখে পেন্সিল বার করল আঁকবার জন্য।

হঠাৎ আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমার পায়ের নিচে থেকে সরে গিয়ে একখানা ইটের টুকরো পড়ল ঠিক তার পিছনেই। মেয়েটি চমকে ফিরে দাঁড়াল। তারপরেই তাকাল উপরের দিকে। অপরাধীর মতো আমি বললাম : সো সরি।

মার্জনা ভিক্ষা করলাম দু হাত যুক্ত করে।

মেয়েটি ইংরেজীতেই জবাব দিল। বলল: এর জন্যে লজ্জার কী আছে!

আলাপ এইখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না। শেষ করতে আমার ইচ্ছা হল না। শুধু মেয়ে বলে নয়। মনে হল, তার চেয়েও আকর্ষণীয় হবে তার কাজ। নালন্দা তো সবাই দেখতে আসে। এমন করে কাজ করতে আসে কজন! তার উপর বিদেশী মেয়ে। বললাম: আপনাকে একটু সাহায্য করব?

সাহায্য!

মেয়েটি বড় বিস্মিত হল!

অপ্রতিভ ভাবে আমি বললাম: হ্যাঁ, সাহায্য। অবশ্য যদি আপনার প্রয়োজন থাকে।

নিচে থেকে মেয়েটি আমার মুখের দিকে চাইল স্থির ভাবে। অদ্ভুত এক প্রশ্ন তার চোখের দৃষ্টিতে। মনে হল, এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে আমার ভিতর আর বাহির দুই-ই দেখে নিচ্ছে। আমি সঙ্কুচিতভাবে বলে ফেললাম: না না, আপনার সম্মতি না থাকলে আমি আপনাকে বিরক্ত করব না।

মেয়েটি হেসে ফেলল, বলল: আপনার সাহায্য আমি নেব।

নেবেন!

ছেলেমানুষের মতো আমি খুশী হয়ে উঠলাম।

মেয়েটি আবার একটুখানি হাসল।

এবারে তার হাসিতে আমি লজ্জা পেলাম।

উত্তর-জীবনে প্রয়োজন হবে ভেবে কলেজে অর্থনীতি পড়েছিলাম। এখন দেখছি, সে আমার ভুলই হয়েছে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অর্থের প্রয়োজন অপরিহার্য, অর্থনীতির নয়। নীতির কথা ভুলে গেলে জীবনটা বুঝি সহজ হবে। কিন্তু আজ আর একটা দুঃখ বড় হয়ে দেখা দিল। সে অজ্ঞানতার দুঃখ। এই যে

একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছি, এর সম্বন্ধে কিছুই আমার জানা নেই। অথচ জানবার কত জিনিস ছিল, কত জিনিস জানত এখানকার মানুষরা। তাদের সম্বন্ধেও আমার কোন ধারণা নেই। আজ যদি অন্য সব যাত্রীর মতো চারিদিকে শুধু চেয়ে দেখেই ফিরে চলে যাই, তা হলে আমার অজ্ঞানতা আর কোনদিনই ঘুচবে না। চোখে দেখেও যে শেখে না, সে মূর্খ থাকে সারা জীবন। মনে মনে স্থির করে ফেললাম যে আমি মূর্খের মতো ফিরে যাব না। দেরি না করে আমি সেই বিদেশী মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

কাজ করতে করতেই মেয়েটি বলল: আপনি নিশ্চয়ই পুরাতত্ত্বের ছাত্র!

মাথা নেড়ে বললাম: না।

তবে কি ইতিহাসের?

লজ্জিতভাবে বললাম: তাও না।

সেই সঙ্গেই যোগ করলাম: তবে ইতিহাস আমার ভাল লাগে।

মেয়েটি খুশী হয়ে বলল: তাই বলুন।

আমি পাশ থেকে তার খাতার উপর ঝুঁকে লেখাগুলো দেখবার চেষ্টা করলাম। এ বুঝি প্রাচীন মগধী অক্ষর, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপিতে এই অক্ষরের ছবি দেখেছি। পড়বার চেষ্টা কোন-দিন করি নি। বোঝবার চেষ্টা তো নয়ই। মেয়েটিকে সে কথা বললাম না। বললাম: পড়াশুনো আমি শেষ করে ফেলেছি। কিন্তু কিছুই শিখি নি বলে মনে মনে এখন দুঃখ পাই।

মেয়েটি বলল: এ দুঃখ ভাল। না শেখার দুঃখ থাকলে আরও শেখার সম্ভাবনা থাকে। আপনার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় নি।

তা হয় তো সত্য: আমি তার কথা মেনে নিলাম: কিন্তু নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি ভরসা পাই নে।

একটা জায়গায় এসে মেয়েটি থেমে গেল। পকেট থেকে

বিবর্ধন কাচটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল দেওয়ালের একটা অংশ। তারপর বলল: এই অক্ষরটা পড়তে পারেন?

আমি পড়ব এই অক্ষর।

আমি চমকে উঠলাম।

কেন, ভয় পেলেন নাকি?

বললাম: ভয় পাবার কথাই যে বলছেন।

বিবর্ধন কাচটা পকেটে রেখে মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকাল। স্থির দৃষ্টিতে দেখল আমাকে। মনে হল, আমার ভিতরটা দেখছে ভাল করে। সাহায্য করবার নামে আমি কি তার সঙ্গে তামাসা করেছি! পুরাতত্ব জানি নে, ইতিহাস জানি নে, দেওয়ালের গায়ে যে লেখা আছে ছবির মতো তাও পড়তে জানি নে। তবে আমি কী সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম! আর দশজন পুরুষের মতো আমি কি তার রূপের মোহেই এগিয়ে এসেছি! ছি ছি, কী ভাবছে এই বিদেশী মেয়েটা! ভারতীয়েরা বুঝি এমন হ্যাংলা হয় যে নিরালায় মেয়ে দেখে ভাব করতে আসে সাহায্য করার নামে! সহসা আমার মাথা নত হয়ে গেল। এই মেয়েটার দৃষ্টির সামনে আমি আর সোজা ভাবে তাকাতে পারলাম না।

মেয়েটি কিন্তু হেসে ফেলল, বলল: তবে আপনি কী সাহায্য করবেন?

এই হাসিতে আমি সাহস পেলাম, ভরসা পেলাম এই ভেবে যে আমি যা ভেবেছি সে তা ভাবে নি। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম: এঁকে দেব?

আশ্চর্য হয়ে মেয়েটি বলল: লেখা আপনি আঁকেন?

আঁকি ছবি: আমি জবাব দিলাম: এই লেখাগুলোকে ছবি ভাবলেই আমি এঁকে দিতে পারব।

কথা না বলে মেয়েটি তার খাতাখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি সেখানা হাতে নিলাম, নিলাম তার পেনসিলটাও।

কতটা টুকেছে দেখে নিয়ে বাকি কয়েকটা লাইন এঁকে দিলাম খস খস করে।

মেয়েটির দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন আর ধরে না। সংক্ষেপে শুধু বলল : অদ্ভুত!

আনন্দে আমার কণ্ঠরোধ হল। নিঃশব্দে তার খাতা আর পেনসিল দিলাম ফিরিয়ে।

আপনি পড়তে পারেন না?

মেয়েটি জানতে চাইল।

বললাম : বাঙলা আর ইংরিজি পড়তে পারি। একটু একটু সংস্কৃতও।

আমি এই ভাষার কথা বলছি।

বললাম : আর কোন ভাষাই আমি জানি না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য কেন?

আশ্চর্য নয়! এই ভাষা পড়তে জানেন না, অথচ লিখে দিলেন খস খস করে। এই কয়েকটা কথা টুকতে আমার সারাদিন সময় লাগত।

তারপর পাতা উল্টে দেখাল : দেখুন, এইটুকু কাজ করতে আমার কতদিন সময় লেগেছে!

বিস্ময়ে আমিও অভিভূত হয়ে গেলাম। দিনের পর দিন মেয়েটা এই কাজ করছে! কিন্তু কেন করছে! কী লাভের জন্য করছে! গবেষণা! কথাটা নিজের কাছেই যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। একটা বিদেশী মেয়ে একা দেশ ছেড়ে এসে নালন্দার ভাঙা ইঁট নিয়ে গবেষণা করবে, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এবারে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে।

মেয়েটি বুঝি লজ্জিত হল, বলল : কী দেখছেন?

দেখছি আপনাকে : আমি জবাব দিলাম : এ আপনার কেমন আচরণ ?

কেন ?

সে বুঝি চমকে উঠল।

বললাম : কী লাভ হবে এই দেওয়ালের দাগ টুকে ?

লাভ : এক মুহূর্ত ইতস্তত করে উত্তর দিল : লাভের কথা জানতে চাইবেন না। এ শুধু কৌতূহল।

কৌতূহল আমারও বাড়ল। শুধু মাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য কি মানুষ এমন পাগলামি করে! মেয়েটি বুঝি আমার মনের কথা বুঝতে পারল, বলল : একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছেন ? আসুন আমার সঙ্গে।

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে আমি পাশের ঘরে এলাম।

দেখুন তো এই ঘরের দেওয়াল। কোন লেখা দেখছেন কি এর গায়ে ?

ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললাম : না।

হেসে সে আমায় তার পাশের ঘরে নিয়ে গেল, বলল : এ ঘরে ?

তেমনি করে খুঁটিয়ে দেখে বললাম : এ ঘরেও দেখছি না।

আরও কয়েকখানা ঘর দেখলাম। কিন্তু কোন ঘরেই লেখা দেখতে পেলাম না। আমার কৌতূহল বাড়ছে উত্তরোত্তর। আমি আমার অসংখ্য প্রশ্ন দৃষ্টি দিয়ে বিস্তার করে দিলাম। উত্তরে মেয়েটি শুধু হাসল।

মনে হল, আমাদের পরিচয়ের সঙ্কোচ বুঝি সহসা ঘুচে গেছে। বললাম : হাসলে চলবে না। সব কথা আমাকে বলতে হবে।

হাসতে হাসতেই মেয়েটি আমাকে তার পুরনো ঘরে ফিরিয়ে আনল। বলল : এবারে এই ঘরটা একবার ভাল করে দেখবেন তো!

দেখলাম। দেওয়ালে কত রকমের লেখা, ছবি কত রকমের।

ছবিগুলো খুব ভাল করে দেখুন।

মেয়েটি অনুরোধ জানাল।

তার অনুরোধের মানে বুঝতে আমার একটুও সময় লাগল না। একটি মেয়ের ছবি। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে একটি বিশেষ মেয়েকে শিল্পী দেওয়ালের গায়ে ধরে রেখেছে। কী অদ্ভুত দক্ষতা!

আর কিছু প্রশ্ন আছে?

মেয়েটি জানতে চাইল।

আত্মস্থ ভাবে উত্তর দিলাম: না।

আমার উত্তর শুনে সে খুশী হল না, বলল: এতটুকুতেই আপনার কৌতূহল মিটে গেল?

বললাম: কৌতূহল মেটে নি তো। কৌতূহলী হবার যে কারণ আছে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম।

তাই বলুন।

আশ্বস্ত হল সেই বিদেশী মেয়েটি।

একটুখানি ইতস্ততঃ করে বললাম: যদি অনুমতি দেন, তা হলে আর একটি কথা জানতে চাইব।

কী বলবেন আমি জানি।

জানেন আপনি!

আমি আশ্চর্য হলাম।

মেয়েটি বলল: এই অদ্ভুত জিনিসটা আমি জানলাম কী করে, এই তো!

ঠিক তাই।

সে কথার জবাব সে আমাকে দিল না। বলল: আপনার নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে!

আপনার পেয়েছে বুঝি?

তারপর নিজের ঝোলাটা দেখিয়ে বললাম : রাজগীরের জল আছে, হজমী ওষুধের মতো ভাল জল। দেব একটু ?

আমি তার হাসিটি দেখতে পেলাম। বলল : আমার সঙ্গেও জল আছে, গরম জল।

বলে সেই ঘরের কোণা থেকে তার নিজের ঝোলাটি সংগ্রহ করে নিল। তারই ভিতর একটা ফ্লাস্কের ঢাকনা দেখতে পেলাম।

আসুন, একটা ভাল জায়গায় বসা যাক।

বলে সে বেরবার পথ ধরল।

নীরবে আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

॥ দুই ॥

দাওয়ার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হল সেই বিরাট গাছটার নিচে। দাওয়া সেই মেয়েটার নাম। তিব্বতের মেয়ে। ভারত-সীমান্তের কাছে তাদের বাড়ি। তাই লেখাপড়া শিখেছে গ্যাংটক আর দার্জিলিঙে। ইংরেজী ভাল জানে, হিন্দীও বুঝতে পারে। নালন্দায় এসেছে কয়েকদিন আগে, উঠেছে স্টেশনের কাছে সেই তিব্বতী ধর্মশালায়। ভাল লাগলে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি যোগ দেবে।

নালন্দার ভিতরটা দাওয়া ভাল করেই চিনেছে। সেই ঘর থেকে উপরে উঠে সদর রাস্তায় এল। সেখান থেকে বাঁয়ে বেঁকে ডাইনে ঘুরে বড় স্তূপটার পাশ দিয়ে গলির ভিতর হয়ে এই গাছের নিচে টেনে আনল। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। ধাপে-ধাপে সিঁড়ি দিয়ে সেই বিরাট স্তূপটার উপরে উঠছে অনেকে। যারা উপরে আছে, তাদের দেখাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মতো। সিঁড়ি তো একটা দুটো নয়, অগণিত সিঁড়ি। অত বড় স্তূপটা নাকি সাত বারে সম্পূর্ণ হয়েছে। সাত তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু।

দাওয়া আমাকে ঠাণ্ডা জল খেতে দিল না। বলল : গরম জল খান।

বললাম : আমার পেটের গোলমাল, গরম জল আমার সহ্য হবে না।

দাওয়া হেসে বলল : চা হল সব রোগের ওষুধ। চা খেতে ভয় পাবেন না।

ভয় না পেয়েই তো আজ এই দশা হয়েছে। পেটের চিকিৎসার জন্যে রাজগীরে পড়ে আছি।

আমি তো অন্য কথা শুনেছি। বাতের চিকিৎসায় লোকে রাজগীর যায়, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে গরম জলের কুণ্ডের ভেতর।

কথাটা মিথ্যা নয়। বললাম : আমার মতো পেটের রুগীও অনেক আছে।

ফ্লাস্কের ঢাকনায় দাওয়া চা ঢেলেছিল। কিছুতেই ফিরিয়ে নিল না। কাজেই আমাকে নিতে হল। শুধু নেওয়া নয়, গিলতেও হল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাওয়া হাসল, বলল : চা পান, না বিষ পান!

ঢাকনা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম : এইবারে আপনার গল্প বলুন।

খানিকটা চা ঢেলে দাওয়া তার পাত্রটা ধুয়ে নিল। তারপর নিজের জন্য খানিকটা ঢেলে নিয়ে বলল : কোন্ গল্প?

কেন, যে গল্প শোনাবেন বলে আমায় ধরে আনলেন।

গম্ভীরভাবে দাওয়া বলল : বুঝেছি।

কিন্তু কিছুই বলল না। একটু একটু করে শুধু চা খেতে লাগল।

তাড়া দিয়ে বললাম : বলুন।

বলতে আমি পারি, কিন্তু তা ভাল লাগবে কি?

কেন ভাল লাগবে না! ভাল লাগবে বলেই তো এতদূর একসঙ্গে এলাম।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। হয়তো গভীরভাবে ভাবছে কোন কথা। যা বলতে চায়, তা বলা যায় কিনা, বলা উচিত কিনা। যাকে বলবে, সে কী ভাববে শুনে! হয়তো এই রকমের কোন ভাবনা।

আমি হলেও ভাবতাম। ভাববার আরও একটা দিক আছে। সেটা ব্যক্তিগত বাধা। বন্ধুর কাছে, পরিবার-পরিজনের কাছে, পরিচিতের কাছে যা বলা যায়, অপরিচিতের কাছে তা সব সময়

বলা যায় না। সামান্য পরিচয়ের মূলধন নিয়ে অকপটে সব কিছু বলার বিড়ম্বনাও আছে। দাওয়া হয়তো এই সমস্তই ভাবছে।

তাকে সাহস দেবার জন্য বললাম: আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি, চেয়েছি সাহায্য করতে।

আস্তে আস্তে দাওয়া বলল: তা জানি। আর এও জানি যে আপনি আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

পারব কি?

দৃঢ়ভাবে দাওয়া বলল: নিশ্চয়ই পারবেন। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

একটু থেমে বলল: সাহায্যের প্রয়োজনও আমার ছিল। একা আমি পেরে উঠছি না। বড় বিচলিত হয়ে পড়ছি।

আনন্দের চেয়ে আমার ভয় হল বেশি। আমার সাধ্য কতটুকু! এমন একটা কঠিন বিষয়ে আমি কী সাহায্য করব!

দাওয়ার চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটুখানি চা দিয়ে ধুয়ে রাখল ঢাকনাটা। ছোট একখানা রুমাল বার করে ঠোঁটের কোণ দুটো মুছে নিল। বললাম: এইবারে বলুন।

দাওয়া বলল: দোহাই আপনার, সব শুনে আপনি আমাকে পাগল ভাববেন না।

হেসে বললাম: সমস্ত বড় কাজের গোড়াতেই তো পাগলামি!

দাওয়া এ কথার উত্তর দিল না। বলল: কেন এখানে এলাম, সেইটেই সবচেয়ে বড় পাগলামি। বিশ্বাস করতে আপনার কষ্ট হবে।

কিছু মন্তব্য করে আমি তাকে বাধা দিলাম না।

দাওয়া বলল: আমাদের দেশের বাড়িতে একটা ভারি সুন্দর পুতুল আছে। একটি মেয়ের মূর্তি। শুনেছি সেটা নালন্দায় তৈরি। আমাদের বংশের কোন পুরুষ নালন্দায় পড়তে এসে-ছিলেন, তাঁরই তৈরি পুতুল।

এত পুরনো : বিস্ময়ে আমি অভিভূত হলাম : সে তো প্রায় হাজার বছরেরও বেশি পুরনো হবে।

হয়তো তার চেয়েও বেশি। কিন্তু ছেলেবেলায় এই পুতুলের গল্প আমরা সবাই বিশ্বাস করেছি। বিশ্বাস করবার আরও একটি কারণ ছিল। সেটি আমাদের দেশীয় রীতিতে তৈরি নয়, চোখ মুখের গড়ন ও বেশবাসও আপনাদের মতো। এই সব দেখেই সকলে বিশ্বাস করতেন যে পুতুলটা ভারতবর্ষে তৈরি।

নালন্দার বলে কেন সন্দেহ করতেন ?

বলেছি তো, আমাদের বংশেরই একজন পুরুষ নালন্দায় এসেছিলেন বোধ হয় অষ্টম শতাব্দীতে। শুনে হাসবেন না, আমাদের পরিবারের বিশ্বাস, তিনি চীনের এক পরিব্রাজক দলের সঙ্গে এসেছিলেন।

হিউএন চাঙের সঙ্গে ?

আপনি উপহাস করবেন আমি জানতাম। কিন্তু এইখানেই আমাদের দুর্বলতা। একটুখানি সমর্থনের লোভে যুক্তির বদলে মনটাকে প্রকাশ করে ফেলি।

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম : ছি ছি, আপনি এ কথা কেন ভাবছেন! আমি আপনাকে উপহাস করতে চাই নি।

কিন্তু দাওয়া আমার কথা বিশ্বাস করল না, বলল : এই ঘটনা নিয়ে আমাদের পরিবারে অনেক গবেষণা হয়েছে। আমাদের বাড়ির কাছেই একটি প্রাচীন গোম্পা। প্রাচীন এইজন্য বলছি যে এত পুরনো পুঁথি আমি কোথাও দেখি নি। পুরনো বললেও সবটুকু বলা হয় না। অনেক পুঁথি আর উল্টেপাল্টে পড়ার মতো নেই। সেগুলো শুধু দেখবার জন্যেই সাজানো থাকে।

দাওয়া থামল না, বলল : আমার ঠাকুর্দার এক ছোট ভাই ওই মঠে লামা ছিলেন। তিনিই গবেষণা করেন ওই সমস্ত পুঁথি-পত্র নিয়ে। তাঁর কাছেই আমরা নালন্দার গল্প শুনেছি। তিনি

আমাদের অনেক কথা বলেছেন। সে সব কথা আপনি একটাও বিশ্বাস করবেন না।

বললাম : নিশ্চয়ই করব, আপনি বলুন।

দাওয়া বলল : আপনাদের বিশ্বাসের পরিধি বড় ছোট। যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে সেই গণ্ডি দিনে দিনে সঙ্কুচিত করে আনছেন। কিন্তু আমাদের তা নয়। যা ভাবা যায়, তা তো বিশ্বাস করিই, যা কল্পনা করাও যায় না, তাও করি। সোজা কথায়, আমরা কোন কিছুই অবিশ্বাস করি নে।

বললাম : এ বড় ভাল অভ্যাস। মনে বেশ শান্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু আমি পেলাম কই : দাওয়া প্রতিবাদ করল : আপনাদের জগতে এসে আমার সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে। নালন্দার গল্প আজ বিশ্বাস হচ্ছে না। আর হচ্ছে না বলেই এখানে এসে পড়ে আছি।

বললাম : সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটু তফাত হয়ে গেল। কোনকিছু বিশ্বাস না হলে আমরা কাজ করতেই বেরই না।

দাওয়া বলল : বেরিয়েছি কৌতূহলে। সেই গল্পটা বলতে বাকি আছে।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম : সেই গল্প শোনবার জন্যেই তো অপেক্ষা করে আছি।

সত্যি বলছেন ?

মনে মনে আমিও জানি, আমাদের এই যোগাযোগ নিতান্তই আকস্মিক। দেখা হবার আগে আমরা ভাবতেও পারিনি যে আমাদের এখানে দেখা হবে। পথ চলতে চলতে মুখোমুখি দেখা হলেও আমরা দাঁড়াতাম না। একজন আর একজনকে যে আমরা চিনি না। এই বড় গাছটার নিচে বসেই আমাদের পরিচয় হল। সে পরিচয়ও সম্পূর্ণ নয়। যতটুকু না জানলে আলাপ করা যায়

না, ততটুকুই শুধু জানি। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে। অন্ধকার হবার আগেই ছাড়াছাড়ি হবে আমাদের। পরিচয়ের শেষ সেইখানেই। আর কোনদিন হয়তো দেখা হবে না। দেখা হবার দরকারও থাকবে না। দাওয়া তার গবেষণার জন্য আরও কিছু-দিন এখানে কাটাবে। আমি থাকব রাজগীরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টায়। একদিন সে তিব্বতে ফিরবে, আর আমি বাঙলাদেশে। ফিরে গিয়ে আমার কথা তার মনে থাকবে কি না জানি নে, তার কথা আমার স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে যাচ্ছে। দাওয়ার মতো মেয়ে আমি কম দেখেছি। হয়তো দেখি নি। বললাম ঃ তা না হলে কাছে এসে বসলাম কেন!

দাওয়া আর দেরি করল না। বলল ঃ যার কথা আপনাকে বলছিলাম, তার নাম ছেরিঙ টাশি। কতদিন আগের মানুষ তার সন-তারিখ খুঁজে পাই নি। মানুষটাকে আবিষ্কার করলে তার সন-তারিখও পাওয়া যাবে। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। আমাদের দেশে আপনি যাননি। গেলে অনেক কথা আপনার বুঝতে কষ্ট হত না।

বললাম ঃ এমনিতেও কষ্ট হবে না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে দাওয়া বলল ঃ আমাদের দেশে শিক্ষার এখনও ভাল ব্যবস্থা নেই। সে যুগে হয়তো কিছুই ছিল না। কিন্তু ছেরিঙ টাশি তার শৈশবেই পালিয়ে গেল, মঠে ভর্তি হল লামা হবার জন্যে। লামাদের বই আছে, লেখাপড়ার ব্যবস্থাও আছে কিছু। লামা হয়ে মঠে থাকতে পারলে সারাজীবন লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। সুযোগ পেয়েও ছিল।

দাওয়া হঠাৎ বলল ঃ আমাদের দেশের লামাদের সম্বন্ধে হয়তো আপনি অনেক কথাই শুনে থাকবেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে সেটাই তাদের শেষ কথা নয়। প্রত্যেক মঠে আপনি এমন লামার সাক্ষাৎ পাবেন যাঁরা বিদ্যায় বিনয়ে ত্যাগে আপনাকে

মুগ্ধ করবেন। ছেরিঙ টাশি এইরকম কোন লামাকে তার গুরু পেয়েছিল। তার এই সৌভাগ্যের কথা সে নাকি পুঁথির পাতায় উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখে গেছে।

তিনি কি তাঁর আত্মজীবনী লিখে গেছেন ?

আমি জানতে চাইলাম।

দাওয়া বলল : আমরা তার জীবনী রচনা করেছি।

আপনারা ?

আমার বিস্ময়ের যেন শেষ নেই।

দাওয়া হেসে বলল : অমন আশ্চর্য হবেন না। লিখে সে নিজেই গেছে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে লিখেছে। আমরা সেই টুকরো-গুলোকে জুড়ে একটা সমগ্র জীবনী গড়বার চেষ্টা করছি।

আমি কোন প্রশ্ন করলাম না। দাওয়া বলল : তার শৈশবের কথা তো মঠেই পাওয়া গেছে তার নিজের লেখার ভেতর। তার-পরে খানকয়েক চিঠি আছে নালন্দা থেকে লেখা। সেগুলোও আমাদের মঠে সযত্নে রাখা আছে। সম্প্রতি আর একখানি পুঁথি মঠেই পাওয়া গেছে। রোজনামচার মতো লেখা। এই সমস্ত জড়িয়ে আমরা তার জীবনী রচনা করেছি।

ছেরিঙ টাশির গল্প শোনবার জন্য আমি ব্যস্ততা প্রকাশ করলাম।

দাওয়া বলল : খুব সুন্দর চেহারা ছিল ছেরিঙ টাশির। গ্রামের মেয়েরা তাকে সংসারী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হতে পারে নি। একদিন খবর পেল যে চীন থেকে পরি-ব্রাজকের একটা দল ভারতে যাচ্ছে। সেখানে তারা সমস্ত শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখবে। ছেরিঙ টাশির শখ হল, সেও যাবে। ভারতে আসবার পথ আমাদের গ্রামের ওপর দিয়েই। তারপরে সেই পরিব্রাজকের দল আমাদের মঠেই রাত্রি যাপন করবেন। কাজেই অসুবিধা কিসের। বড় লামা তাঁর প্রিয় শিষ্যের

ভারতে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কতদিন পরে ফিরলেন?

আমি প্রশ্ন করলাম।

দাওয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: যতদূর আমরা জানতে পেরেছি ছেরিঙ টাশি আর ফিরে আসে নি।

সেকি!

আমার যেন বিশ্বাস হল না এ কথা।

দাওয়া বলল: ঠিকই বলছি। যা ফিরে এসেছিল, তা অন্য জিনিস। কিছু পুঁথিপত্র, জামা-কাপড় আর সেই পুতুলটা।

সেই পুতুলটা!

সেই পুতুলটার কথাই তো আমি আপনাকে গোড়ায় বললাম।

কী বলব আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না।

দাওয়া বলল: কৌতূহল ঠিক এজন্যে নয়, কৌতূহলের কারণ অন্য। ছেরিঙ টাশির অসমাপ্ত পুঁথিপত্রের শেষে একটি লাইন পড়া গেছে। তা অন্য কোন হাতের লেখা। মনে হয়, মঠের বড় লামা নিজে সেই কথাকটি লিখেছিলেন।

ছেলেমানুষের মতো আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী কথা?

দাওয়া বলল: কী কী পেয়েছিলেন, তার একটা লিস্ট ছিল। একটা জামার পাশে লেখা 'রক্তমাখা'।

রক্তমাখা!

আমি চমকে উঠলাম।

দাওয়া বলল: সেই জামা আমরা দেখেছি। দেখেছি সেই পুঁথিখানাও। তারও একটা পাতায় কালচে দাগ। আমার ছোট ঠাকুর্দার ধারণা ছিল, সেও রক্তের দাগ।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

দাওয়া বলল: ছেরিঙ টাশি ফিরে আসে নি। এসেছিল একটা মেয়ে-পুতুল। আর খানিকটা রক্তের দাগ।

হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। বললাম : ছেরিঙ টাশি কি পুতুল গড়তে জানত ?

আমার এই প্রশ্ন শুনে দাওয়া অপরিসীম খুশী হল। বলল : এতখানি জেনে আমিও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলাম।

বলে শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

বললাম : এ প্রশ্ন তো সঙ্গত প্রশ্ন।

দাওয়া বলল : জানত। তার লেখার ভেতর নাকি আছে। কিছু মূর্তিও দেখেছি আমাদের মঠে। তবে সেগুলো কার তৈরি তা কেউ বলতে পারে না। একটু থেমে বলল : এবারে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন আমি নালন্দায় কেন এসেছি ?

কিছু পেরেছি।

দাওয়া বলল : প্রথম কয়েক দিন আমি অন্ধের মতো খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও কিছুর সন্ধান পাই নি। তারপরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম জাদুঘরের একটি মূর্তি দেখে। দেবতার নাম লেখা মূর্তি।

কেন স্তম্ভিত হলেন ?

ঠিক সেই পুতুলটা, আমাদের দেশে যা আছে।

তারপরে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল : আমার কী মনে হয় জানেন ? আমার মনে হয়, ও দেবতার মূর্তি নয়। ও কোন মেয়ের মূর্তি। ওই মেয়েটার জন্যেই ছেরিঙ টাশি দেশে ফিরতে পারে নি, ফিরেছিল শুধু কয়েক ফোঁটা রক্ত।

এক রকমের অদ্ভুত অনুভূতিতে দেহ আমার অবশ হয়ে এল।

অন্যমনস্কভাবে দাওয়া বলল : আমায় আপনি সাহায্য করবেন বলেছিলেন, তাই না! সত্যিই যদি করেন তবে আমি ছেরিঙ টাশির রহস্য নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে পারব।

দাওয়াকে আমি কথা দিলাম : সাহায্য করব।

॥ তিন ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা থেকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সামনের দিকে, তারই শেষপ্রান্তে নালন্দার জাতুঘর। মুক্ত প্রশস্ত অঙ্গন। খানতিনেক বাড়ি। দক্ষিণের বাড়িটিতে জাতুঘর। দাওয়া বলেছিল ঃ নতুন কিছু বলবার আগে আপনাকে জাতুঘরের একটা মূর্তি দেখাব। একটি মেয়ের মূর্তি।

আমরা তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলাম। জাতুঘরে আসবার পথে দেখে এলাম বড় স্তূপের পাশে দেওয়ালে খোদাই করা কয়েকটি মূর্তি। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। বুদ্ধের মূর্তি। ছবিতে এসব মূর্তি অনেক দেখেছি। দাওয়া বলছিল ঃ এইসব মূর্তি আপনাকে কেন দেখালাম জানেন ?

জানি না।

এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কিছু আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। নারীর মূর্তি আমি এখনও দেখি নি।

এ কথায় আমি বিস্মিত হলাম না। বললাম ঃ নালন্দায় শুনেছি নারীর অধিকার ছিল না অধ্যয়নের।

দাওয়া খুশী হয়ে বলল ঃ ঠিক বলেছেন। পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিতেরই এই ধারণা। কিন্তু—

দাওয়া থামল।

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম ঃ আপনি কি অন্যরকম সন্দেহ করেন ?

দাওয়াকে বড় চিন্তিত দেখাচ্ছিল। বলল ঃ না। সন্দেহ যা করি, তাই নিয়েই গবেষণা করতে চাই।

সে কী ?

তার জন্যে আমাকে আর একটু সময় দিন। আমি দেখতে চাই, আপনারও কিছু সন্দেহ হয় কিনা! যদি হয়, তবে আমাদের আরও সুবিধা হবে।

সুবিধা কেন হবে?

সুবিধা হবে না! একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা দুজনেই গবেষণা করব।

তা বটে।

জাদুঘরের ভিতর অনেকগুলো ঘর আছে। তারই একটি ঘরে দাওয়া আমায় টেনে আনল। একটা ধারে এসে আস্তে আস্তে বলল: এই মূর্তিটা দেখুন।

একটি মেয়ের মূর্তি। নিচে একটা দেবতার নাম। পরিচিত দেবতা, কিন্তু ভঙ্গিটি পরিচিত নয়। দাওয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল কঠিন দৃষ্টি নিয়ে। কিছু বলছি না দেখে বলল: কী দেখছেন বলুন তো!

একটি দেবীর মূর্তি।

ভাল করে দেখুন।

ভঙ্গিটি কিন্তু মানুষের মতো।

দাওয়া খুশী হল অপরিমিত। বলল: তারপর?

বললাম: হিন্দু দেব-দেবীর অনেক মূর্তি দেখেছি, ছবিও দেখেছি অনেক। কিন্তু এই মূর্তিটি দেখে দেবী বলে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

দাওয়ার চোখজোড়া যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। বলল: তবে কী মনে হচ্ছে বলুন তো?

আরও একটু ভাল করে লক্ষ্য করে বললাম: মনে হচ্ছে, কোন সাধারণ মেয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

কথাটা বলেই আমি দাওয়ার মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটা

আনন্দে বুঝি গলে পড়বে। বলল: আপনি শিল্পী বলেই বোধ হয় এ কথা এত সহজে বলতে পারলেন।

শিল্পী না হলেও আমি এই কথাই বলতাম।

কিন্তু সকলে তো এ কথা বলে না।

দাওয়া উত্তর দিল ব্যথিত স্বরে।

হেসে বললাম: তারা ভাল করে দেখে না, কিংবা তাদের অনুভূতি খুব ভোঁতা।

দাওয়া বলল: এইবারে আসুন, আপনাকে সমস্ত মূর্তিগুলো ভাল করে দেখাই। সব কিছু দেখবার পরে আপনার মতামত আমাকে বলবেন।

আমরা ঘুরে এই জাদুঘরটা দেখলাম। মূর্তিই বেশি। বুদ্ধের মূর্তি, নানা আকারের, নানা ভঙ্গির। দেবতারও মূর্তি আছে। দু-একটি দেবী-মূর্তিও দেখলাম। সবই মোটা কাজ। সূক্ষ্ম কাজ আছে আর একটা ঘরে। সে সব ছোট ছোট মূর্তি। বড় মূর্তিতে সূক্ষ্ম কাজের নিদর্শন নেই। আর একটা ঘরে নিত্যব্যবহার্য তৈজস-পত্রের অসংখ্য নমুনা আছে। এ সমস্তই পাওয়া গেছে নালন্দার মাটি খুঁড়ে। মূর্তিও সব নালন্দার। কে তৈরি করেছে, কেন করেছে, তার পরিচয় নেই। পরিচয় আছে মূর্তির আর হিসেব আছে বয়সের। সে সব নাকি অনুমান করা যায়। অনুমান ভুল হলেও ধরা পড়বার ভয় নেই। দাওয়া আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল, বলল: মূর্তির নিচে পরিচয় লেখা না থাকলে কি বেশি ক্ষতি হত?

ক্ষতি আর কী!

আর এই সন তারিখ?

আমাদের কাছে এর দাম নেই।

কারও কাছেই হয়তো নেই।

কেন?

দাওয়া বলল ঃ এসব হিসেব আমি নির্ভুল বলে ভাবতে পারি নে।

আমি প্রতিবাদ করলাম মৃদুভাবে, বললাম ঃ এই তত্ত্ব আমাদের জানা নেই বলেই হয়তো এই রকম ভাবি। জানলে এ সব মেনে নিতে হয়তো আপত্তি হত না।

দাওয়া তাড়াতাড়ি বলল ঃ আপনি আমাকে আর একটি কথার উত্তর দিন।

বলুন।

দাওয়া বলল ঃ এইসব মূর্তির নাম আর বয়সটাই কি সব? এদের আড়ালে যে শিল্পী আছে, শিল্পী-মন, তার কি কোনও দামই নেই?

প্রশ্নটা অদ্ভুত নয়, কিন্তু নতুন প্রশ্ন। জাদুঘরের কর্তৃপক্ষেরা কেউ এ প্রশ্ন কোনদিন করেন নি। শুধু নালন্দায় নয়, পৃথিবীর কোন জাদুঘরেই এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে না। মূর্তি আছে, তার নাম আছে, কোথায় পাওয়া গেছে তার পরিচয় আছে, আর আছে বয়সের হিসেব। এর বেশি জানবার প্রয়োজন নেই, কৌতূহলও নেই। যারা দেখতে আসে, তাদেরও কোন কৌতূহল জাগে না। এই তো নিয়ম। চট্ করে আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

দাওয়া বলল ঃ এই যে মূর্তিগুলি পাশাপাশি সাজানো আছে, একই জায়গায় পাওয়া একই ধরনের মূর্তি, কেউ তো জানতে চায় না তাদের শিল্পীর কথা! এগুলো একজনের তৈরি, না নানাজনে তৈরি করেছে এগুলো, এ নিয়ে আজও পর্যন্ত কাউকে আমি ভাবতে দেখি নি।

তর্কের খাতিরে বললাম ঃ জাদুঘরের জন্য তার প্রয়োজন হয় না। এখানে ব্যক্তি তো বড় নয়, বড় হল তার দেশ, তার সভ্যতা। একটা দেশের একটা যুগের সভ্যতাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখছি। জাদুঘরে তাই শিল্পী বড় নয়, পরিচয় পাওয়া যায় না কোন শিল্পী মনের।

তাই বলে র‍্যাফেল রবিবর্মা অবন ঠাকুরকে লোকে ভুলে যাবে?

দাওয়ার গলার স্বর শোনাল আর্তনাদের মতো।

বললাম: জগতের নিয়মই তো তাই। অজন্তায় ইলোরায় কোন শিল্পীর নাম আছে? না, আছে তাজমহলের দেয়ালে লেখা?

দাওয়া প্রতিবাদ করল, বলল: কে বললে লেখা নেই?

আমি তার উত্তর শুনে চমকে উঠলাম, বললাম: আছে লেখা?

শান্তভাবে দাওয়া বলল: ওসব জায়গা তো আমার দেখা নেই। কিন্তু বিশ্বাস করি যে চেষ্টা করলে সেখানেও শিল্পীর নাম পাওয়া যাবে।

আমার বিশ্বাস হল না। তাই উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলাম।

আপনার বুঝি বিশ্বাস হল না?

আমি সমর্থন করলাম তার কথা।

দাওয়া বলল: আপনার কাছে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেছিলাম। আপনি শিল্পী কিনা, ভেবেছিলাম আপনার চোখ আমার চেয়ে ভাল হবে।

এই অভিযোগে আমি লজ্জিত বোধ করলাম। বললাম: কোথাও কোন ভুল করেছি বুঝি?

দাওয়া বলল: ভুল নয়। আমার বিশ্বাস, শিল্পীর দৃষ্টি হয় অন্তর্যামীর মতো।

অতটা না হলেও কিছুটা সত্য বটে। কিন্তু আমি কোন উত্তর দেবার আগেই আবার বলল: আসুন এবারে সেই পুতুলটার সামনে।

বলে পাশের ঘরে আমায় ডেকে আনল।

বলল: দেখুন তো ভাল করে। শিল্পীর নাম কোথাও দেখছেন কিনা?

এবারে ভাল করে দেখলাম। দেখতেও পেলাম। পায়ের কাছটায় কয়েকটা আঁচড় আছে, পুরনো আঁচড়। কোন অক্ষরও হতে পারে, কয়েকটি অক্ষর।

কঠিন দৃষ্টিতে দাওয়া আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, বলল: কী দেখছেন?

বললাম: আপনার কথাই ঠিক। আমার শিল্পীর দৃষ্টি নয়।

না না, একথা বলবেন না: দাওয়া প্রতিবাদ জানাল: এমন কথা আমি আপনাকে বলি নি।

বললাম: মনে হচ্ছে, কিছু লেখা আছে। প্রাচীন মগধী ভাষা হতে পারে।

খুশী হয়ে দাওয়া বলল: কতকটা আমাদের উঁচে বর্ণমালার মতো।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম: তবে তো নিশ্চয়ই পড়তে পেরেছেন!

দাওয়ার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল: অনুমান করতে পেরেছি।

অনুমান কেন?

খানিকটা তফাত আছে।

বলে আঙুল দিয়ে একটা লাইন দেখিয়ে বলল: এই টানটা যদি এমনি হত, আর এইখানটা এই রকম, তা হলে ছেরিঙ বলতাম। ছেরিঙ মানে জানেন?

না।

আমাদের ভাষায় ছেরিঙ মানে হল পূজারী। খুব প্রচলিত নাম। নিমা ছেরিঙ, পেম্ ছেরিঙ, ছেরিঙ পেনছো, ছেরিঙ টাশি—এসব পুরুষের নাম। মেয়েদের নামও হয় ছেরিঙ দিয়ে, যেমন ছেরিঙ ছ্যুতেন।

আমার ভারি আশ্চর্য লাগছিল। সেই কথা তাকে বললাম।

দাওয়া বলল ঃ তবে আপনাকে আর একটা জিনিস দেখাই।

বলে তার পকেট থেকে সেই খাতাটা বার করল। একটা পাতা বার করে বলল ঃ মিলিয়ে দেখুন তো এই লেখাটার সঙ্গে।

মেলাতে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ঠিক একই লেখা। বললাম ঃ এ লেখাটা কোথায় পেয়েছেন?

উজ্জ্বল চোখে দাওয়া বলল ঃ এ তো আপনারই হাতে আঁকা। ওই ভাঙা ঘরের দেওয়াল থেকে আপনিই আমাকে তুলে দিয়েছেন।

সত্যিই তো, এ আমারই হাতে আঁকা! একই লেখা, একই লোকের হাতে লেখা! বিস্ময়ে আমি বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম!

দাওয়া বলল ঃ খুবই আশ্চর্য লাগছে, তাই না!

এই মুহূর্তে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না যে ছেরিঙ নামে কোন মানুষ একদা ওই ঘরে বাস করত। সে শিল্পী ছিল। আর সামনের এই মেয়ের মূর্তিটা তারই তৈরি। বললাম ঃ কিন্তু মেয়েটা কে?

দাওয়া হাসল। বলল ঃ ছেলেটাকে তা হলে চিনে ফেলেছেন?

বললাম ঃ কিছু অনুমান করতে পারছি।

গম্ভীরভাবে দাওয়া বলল ঃ বলুন আপনার অনুমানের কথা।

এ কথার উত্তর আমি দিলাম না। বললাম ঃ আগে আপনার কথা শুনব।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে দাওয়া বলল ঃ তা হয় না। কয়েক দিন খেটে আমি যা বার করেছি, এক কথায় আমি তা প্রকাশ করব কেন! কয়েক দিন আপনি খাটুন।

নিশ্চয়ই খাটব।

সত্যি বলছেন?

কেন মিথ্যে বলব! আমারও কৌতূহল আছে তো, আমি আপনাকে সাহায্য করব।

দাওয়া বলল : মেয়েটিকে এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। শুধু এইটুকু আবিষ্কার করেছি যে একটি মেয়ে ছিল, আর সেই মেয়ে ছেরিঙের জীবনে এসেছিল ধূমকেতুর মতো।

নালন্দার বিহারে মেয়ে ছিল?

আমি আশ্চর্য হলাম।

দাওয়া বলল : হয়তো ছিল না। ছিল বললে ইতিহাস সে কথা মানবে না। কিন্তু তবু আমি নিশ্চয়ই না বলে হয়তো বলছি। তার কারণ আপনি বুঝতে পারছেন।

বললাম : পারছি না।

দাওয়া বলল : আদিম নিয়ম। ঘরের জানলা বন্ধ করে তো দিনের আলোকে রোধ করা যায় না। রোধ হয় রৌদ্র। এই মেয়েটিকে আমি আলোর সঙ্গে তুলনা করব। বোধ হয় তার বিচরণ ছিল অবাধ।

কিন্তু—

কী একটা কথা আমার মনে আসছিল।

দাওয়া তখুনি বলল : সেই কিন্তুটাই আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

দাওয়ার আর একটি কথা আমার মনে পড়ল। বলেছিল, তাদের পরিবারের এক ছেলে নালন্দায় ছিল। সে আর তাদের দেশে ফেরে নি। যা ফিরেছিল সে কিছু কাগজপত্র আর একটা রক্তমাখা জামা। ছেলেটির কি নাম ছিল, তা ভুলে গেছি। তিব্বতী নাম বড় ভুলো ভুলো। বললাম : আপনি একটা নাম বলেছিলেন?

নাম?

আপনাদের পরিবারে সেই—

আমি তাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

দাওয়া হেসে বলল : ছেরিঙ টাশি।

ছেরিঙ ! এই মূর্তি যে গড়েছে !

আমার বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

দাওয়া বলল : আমি ভেবেছিলাম, গোড়াতেই আপনি তা ধরতে পেরেছেন। বড় খটমট নাম, তাই না ?

লজ্জিতভাবে বললাম : ঠিক তা নয়। ছেরিঙ ও ছেরিঙ টাশি আমার কানে এক রকম মনে হয় নি।

দাওয়া বলল : বুঝেছি।

আমাদের কাজ তো তা হলে ভারি সহজ হয়ে গেল : দাওয়াকে বাধা দিয়ে আমি মন্তব্য করলাম : একজনের জীবনী যখন আমাদের জানা আছে, তখন আর একজনকেও আমরা উদ্ধার করতে পারব।

ছেরিঙ টাশির তৈরি পুতুল আমাদের সামনে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দৃঢ় স্পষ্ট প্রতিবাদের ভঙ্গি। মনে হয়, এ কোন মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। এ প্রতিবাদ কোন সমাজের বিরুদ্ধে, কিংবা কোন রাজনীতির বিরুদ্ধে। দাওয়াকে আমি সেই কথা বললাম : আমার কী মনে হচ্ছে জানেন ? এই পুতুলটি কোন সাধারণ মেয়ের নয়। একদিন আঙুল তুলে এই মেয়েটি সমস্ত নালন্দায় আন্দোলন এনেছিল। একে উদ্ধার করতে পারলে আমরা নালন্দার ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় জুড়তে পারব।

আবেগে দাওয়ার চোখ আবার ছলছল করে উঠল। বলল : আর একটা খবর আপনাকে দেওয়া হয় নি। আমার কাছে যে পুতুলটা আছে, তার নিচেও এমনি করে ছেরিঙ লেখা। আমাদের মঠের লামারা বলেন যে এক সময় এমনি করেই ছেরিঙ লেখা হত।

দাওয়া হাঁপাচ্ছে মনে হল। বড় তাড়াতাড়ি তার বুক ওঠা-নামা করছে। বলল : আর একটা আবছা ছাপ আছে।

রক্তের ছাপ ?

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

দাওয়া বলল : বোধ হয় তাই।

দুজনেই একসঙ্গে কেঁপে উঠলাম।

॥ চার ॥

দাওয়া উঠেছিল তিব্বতীদের ধর্মশালায়, আর আমি রাজগীরের হোটেলে। আমার থাকার জায়গা শুনেই দাওয়া চমকে উঠল, বলল ঃ রাজগীর! সে তো অনেক দূর এখান থেকে!

বললাম ঃ অনেক দূর আর কোথায়! গাড়ি থাকলে এ-পাড়া আর ও-পাড়া।

কিন্তু গাড়ি যখন নেই, তখন আর এ যুক্তি খাটে না।

দাওয়া ভাবল খানিকক্ষণ, তারপরেই বলে উঠল ঃ ঠিক হয়েছে।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম বাকী কথাটুকু শোনবার জন্য।

দাওয়া বলল ঃ আসুন, আমরা এক জায়গাতেই থাকি। তিব্বতী ধর্মশালায় আপনার জায়গা না হলে আমি যাব রাজগীরের হোটেলে।

এই পরামর্শের পিছনে যে অকাট্য যুক্তি আছে তাও দাওয়া এগিয়ে ধরল। বলল ঃ শুধু তো এখানেই ঘুরে ঘুরে দেখা নয়, দেখবার পর সেগুলো সাজিয়ে মিলিয়ে একটা বড় কিছু দাঁড় করানো!

আমি সমর্থন করে বললাম ঃ সে তো সত্যি কথা।

খুশী হয়ে দাওয়া বলল ঃ তবেই দেখুন, আজই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে আমরা তখন রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছি। সেই বড় বড় গাছ, আর তার নিচে চায়ের চালা। জনকয়েক মেয়েপুরুষ দু ধারের বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে। পরিবেশটি

পরিচ্ছন্ন নয়, যারা চা খাচ্ছে তারাও নোংরা ধরনের। ত্ব-একটা মাছিও উড়ছে দেখলাম। কেন জানি না, ওই বেঞ্চে বসে আমারও এক ভাঁড় চা খেতে ইচ্ছে হল। দাওয়াকে সে কথা বলতেই সে হেসে উঠল। বলল : আমার ফ্লাস্কে এখনও ভাল চা আছে। আমি আপনাকে দিচ্ছি।

লজ্জিতভাবে বললাম : আমার ফ্লাস্কে হরলিক্‌স্‌ আছে। চা খাওয়া আমার বারণ।

ঠিকই তো : দাওয়া তখুনি তা মেনে নিল : সেই জন্যেই তো আপনি চেঞ্জে এসেছেন।

হেসে বললাম : সেই জন্যেই বোধ হয় ওই নোংরা চায়ের জন্যে লোভ হচ্ছে।

বিচিত্র নয়!

দাওয়া হাসল।

আমিও হেসে বললাম : আপনার হাসি দেখে মনে হচ্ছে যে সম্মতি পাওয়া গেল।

চায়ের চালার দিকে এগোতে এগোতে দাওয়া বলল : কোন ক্ষতি হবে না তো?

বললাম : লাভ হবে ক্ষতির চেয়ে বেশি।

দাওয়া হাসল পথের দিকে চোখ রেখে।

যারা ঘন হয়ে বসে চা খাচ্ছিল, তারা সরে বসে আমাদের একটু জায়গা দিল। আমরাও বসলাম। ত্ব-ভাঁড় চায়ের ফরমাশ দিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম অনেক দিনের পরিচিতের মতো। দাওয়া বলল : একটা কথা ভেবে আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে।

কী কথা?

ছেলেমানুষের মতো দাওয়া বলল : আপনি বলুন তো!

আমি বলব?

আশ্চর্য হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

চেষ্টা করুন : দাওয়া অনুরোধ জানাল : এ কথা আপনারও নিশ্চয়ই মনে হয়েছে।

বললাম : আমাকে বোধ হয় বেহায়া ভাবছেন।

সেকি, বেহায়া আমি কেন ভাবব : দাওয়ার কণ্ঠে আমি ব্যাকুলতা শুনলাম : আমি ভাবছিলাম—

আমি তার লজ্জা দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

দাওয়াও লজ্জা পেল, বলল : আপনি হাসছেন ?

বললাম : আপনি ভাবছিলেন আমাদের পরিচয়ের ব্যাপারটা। বেশ অদ্ভুত ভাবে আমাদের জানাশুনো হয়ে গেল। লোকে শুনলে সহসা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

দাওয়া খুশী হয়ে বলল : ঠিক বলেছেন। কয়েকটা দিন তো একা একাই কাটালাম। লোক দেখলাম অনেক। কিন্তু আপনার মতো একা মানুষ আমি দেখি নি।

বললাম : একা এসেছি বলেই তো আপনাকে দেখতে পেলাম।

দাওয়া হঠাৎ লজ্জা পেল। বলল : পূর্বজন্মে আপনি বিশ্বাস করেন ?

এ বড় কঠিন প্রশ্ন : আমি উত্তর দিলাম : মন সুস্থ থাকলে সাধারণত করি না।

মানে ?

দাওয়া বেশ বিস্মিত হল।

বললাম : আমি ঠিকই বলছি। বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকলে আমি কোন সংস্কারের কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু দুঃসময়ে সবই করি। বিপদে পড়লে সে দুর্দশাকে পূর্বজন্মের ফল ভেবে খানিকটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। ভগবানকেও ডাকি সে সময়ে। সে ভদ্রলোক শুনতে পান কিনা জানি না, পেলে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসেন।

দাওয়া খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমার কথা শুনেই সে যে হাসল তাতে সন্দেহ নেই, তবু বললাম: হাসলেন যে?

দাওয়া বলল: আপনার কথায়। ভগবানের সম্বন্ধে আপনার উঁচু ধারণা দেখছি।

তা একটু আছে বইকি! আর এই উঁচু ধারণার জন্যেই তো বেঁচে আছি। নইলে পেটের যা অবস্থা!

বলতেই একটা ঢেকুর উঠল। চাওয়ালা দুটো ভাঁড় এগিয়ে দিচ্ছিল। চায়ের রঙ দেখেই বোধ হয় ঢেকুরটা উঠল। ব্যস্তভাবে দাওয়া বলল: এই চা তবে খাচ্ছেন কেন?

চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে বললাম: বেশি চা খেয়েই তো আজ আমার এই অবস্থা। বন্ধুরা বলত, পূর্বজন্মে আমার দেশ ছিল তিব্বত। ছাতু আর চা খেয়েই একটা জন্ম কেটেছে।

দাওয়া হেসে উঠল, বলল: আমরা কি ছাতু আর চা খেয়েই জন্ম কাটাই?

কী করে জানব বলুন! আপনার দেশের মুখ তো আমি কখনও দেখি নি।

দাওয়া হেসে বলল: পূর্বজন্মের কথা আপনার একটুও মনে পড়ে না?

পূর্বজন্মের কথা!

বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল দাওয়ার দু চোখের দৃষ্টি। অদ্ভুত ভাবালু দৃষ্টি। কোথায় কোন্ স্বপ্নরাজ্যে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

সত্যিই মনে পড়ে না একসময় দাওয়া অস্পষ্ট ভাবে জানতে চাইল: কিছুই কি মনে করতে পারেন না?

কেন মনে পড়বে! কী করে পড়বে! কিন্তু দাওয়ার চোখের দিকে চেয়ে সে কথা আমি বলতে পারলাম না। মনে হল, সে ঘুমের ঘোরে এখন কথা কইছে। কিছু বললেই তার ঘুম ভেঙে

যাবে। কী দরকার তার ঘুম ভাঙিয়ে! তার চেয়ে নীরবে তার গল্প শুনে যাই। গল্প শেষ হলে তাকে জাগানো যাবে।

দাওয়া বলল: আমাদের সেই নাম গিয়েল গোম্পা মাথাকাটা পাহারটার ওপর। বড় রাস্তার ধার থেকে বেঁকে ঘুরে ওপরে উঠেছে। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের রাস্তা। তাড়াতাড়ি উঠতে গেলেই হোঁচট খেয়ে পড়বে। ছোট ছেলেমেয়েরা হোঁচট খেয়ে পড়ে, রক্তপাত হয়। তবু সেই পাথর ক্ষয় হয় না। মসৃণ হয় না নাম গিয়েল গেম্পার কর্কশ রাস্তা।

এরই একটা স্যাঁতসেতে ঘরে একরাশ বই আছে। আর একখানা রোজনামচা। একদিন নালন্দায় বসে ছেরিঙ টাশি লিখেছিল। লেখা সমাপ্ত হয় নি, তার আগেই তার জীবন শেষ হয়ে গেল।

ছেরিঙ টাশি মঠে মানুষ হয়েছে। বড় লামা তাকে ভালবাসতেন। ভারতবর্ষ থেকে ঘুরে এলে গোম্পার ভার হয়তো তাকেই দিতেন। অন্ততঃ অন্য লামারা তাই মনে করত। তা না হলে তার অত বড় ধৃষ্টতার কথা শুনে তিনি নির্বিকার ভাবে হাসতে পারেন! ছেরিঙ জানতে চাইত, মেয়েরা কেন মঠে থাকে না, কেন লেখাপড়া শেখে না পুরুষদের মতো। বড় লামাকে বড় অসহায় দেখাত এই প্রশ্নের–উত্তর দিতে। বলতেন, আমরা আর কদিন আছি! তারপর তো তোমাদেরই ব্যবস্থা।

চীনের লামারা যাচ্ছিলেন ভারতবর্ষে। এই মঠের সামনে দিয়ে গেছে পথ। ছেরিঙ ভাবল, এই সময় একবার বুদ্ধের জন্মভূমিটা ঘুরে এলে তার জ্ঞানের পরিধি যাবে বেড়ে। বড় লামা অনুমতি দিলেন। বললেন, একটা শর্ত আছে। আমার মৃত্যুর আগেই তোমায় ফিরে আসতে হবে। সেই সঙ্গেই আশ্বাস দিলেন, ভয় নেই। পাঁচ-দশ বছর আমি নিশ্চয়ই বাঁচব।

এ কথার উত্তর দিলেন চীনের একজন লামা। বললেন, আপনি

নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তো দেশে ফিরব, আমি একে আপনার পায়ে পৌঁছে দেব।

খুশীতে উজ্জ্বল হল বড় লামার মুখ। বললেন, বুদ্ধ তোমাদের মঙ্গল করবেন।

দু হাতে কান চেপে জিভ বার করে ছেরিঙ বসে পড়ল একেবারে বড় লামার পায়ের উপরেই। এমন মানুষকে প্রণাম না করে কি থাকা যায়!

বড় লামা তাকে টেনে তুললেন। বললেন, কী পাগল ছেলে রে বাবা!

তারপর যাত্রা হল শুরু।

॥ পাঁচ ॥

কত পাহাড় কত সমতল ভূমি উত্তীর্ণ হয়ে কত পাথর আর কত বরফের উপর দিয়ে ছেরিঙরা ভারতবর্ষে এল। সবাই সাগ্রহে নালন্দার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। পথ যখন সাত যোজন বাকী, তখন নালন্দার বারোজন ভিক্ষু এলেন তাদের অভ্যর্থনায়। ছেরিঙরা আশ্চর্য হল, তাঁদের মধ্যে একজন চীনের ও একজন তিব্বতের লামাও আছেন। অদ্ভুত ব্যাপার! ভারতবর্ষেও তাদের নিজেদের দেশের লোক আছে!

চলতে চলতে ছেরিঙ এই কথাই প্রকাশ করে ফেলল। তিব্বতী লামা মধ্যবয়সী, গম্ভীর প্রকৃতির। তবু কথার উত্তর দিলেন। বললেন: কিছুদিন আগে এলে ধর্মগুরুকে দেখতে পেতে।

ধর্মগুরু কে?

চীনা ভাষাতেও লামা এই কথা বলেছিলেন। তাই চীনের লামারাও উৎসুক হলেন উত্তর শোনবার জন্য।

লামা তাঁদের দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন: আপনাদের দেশের ইউ আন চাঙ।

তারপরেই বললেন: কী সুন্দর কান্তি! মুখমণ্ডলের জ্যোতিও কী অপরূপ!

যে চীনের লামা এসেছিলেন অভ্যর্থনা করতে, সহসা তাঁর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা গেল। মনে হল, আনন্দে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন। বললেন: জানেন বোধ হয়, সম্রাটের অনুমতি না নিয়েই তিনি এ দেশে এসেছেন। সে কী দুঃসাধ্য কাজ! সমস্ত চীন অতিক্রম করে গান্ধার দেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ

করেছেন। কত কষ্ট, কত পরীক্ষা! বুকে কত বল ছিল, তাই তিনি আসতে পেরেছেন।

তিনি একেবারে একা এসেছিলেন?

একজন জানতে চাইলেন।

চীনের সেই লামা বললেন: একেবারেই একা। পথে নাকি মাঝে মাঝে তিনি সঙ্গী পেতেন। ধার্মিক যারা, বুদ্ধের ভক্ত যারা, তারা তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। বাধাই পেয়েছেন বেশি লোকের কাছে। সরকারের ভয়ে তাঁকে পালিয়ে পালিয়ে দুর্গম পথ দিয়ে চলতে হয়েছে।

ছেরিঙের ইচ্ছে হল সেই পথের গল্প শুনতে। বলল: আপনাদের কাছে সে গল্প শুনতে পাব তো?

লামা আশ্বাস দিয়ে বললেন: পাবে বইকি! ধর্মগুরু বলে গেছেন তিনি একখানা বই লিখবেন। তখন পৃথিবীর সবাই তা জানতে পাবে। যুগে যুগে জানবে।

সত্যকে যুগোত্তীর্ণ করবার জন্যই তো বই লেখা। সত্য যেন ফুরিয়ে না যায়, সত্য যেন ম্লান না হয়—সেই জন্যই সাহিত্য। সত্য চিরদিনই সুন্দর, সাহিত্যে তাই সুন্দরের সাধনা। ধর্মগুরু বলে গেছেন, সত্যকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখতে নেই, মুখে মুখে বিতরণ করেও কর্তব্য শেষ হয় না। লিখে তাকে শাশ্বত করতে হবে। দেশে ফিরে ধর্মগুরু বই লিখবেন।

চীনের লামা বললেন: ইউ আন চাঙকে অভ্যর্থনা করতেও আমরা ঠিক এতদূর এসেছিলাম। আর ঠিক এই চারজনই। লোক জমেছিল মৌদ্‌গল্যায়ণের জন্মস্থানে। কম করেও কয়েক শো।

মৌদ্‌গল্যায়ণের নাম কারও জানা নেই। আগন্তুক সকলেই তাকালেন বক্তার মুখের দিকে। তিনি এই অব্যক্ত প্রশ্ন বুঝতে পারলেন, কিন্তু জবাব দিলেন সংক্ষেপে। বললেন: মৌদ্‌-গল্যায়ণের কথা আপনারা নালন্দায় জানতে পারবেন। তিনি যে

বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বাড়িটি আমাদের সংঘারামের কাছে। ইউ আন চাঙকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে দুশো ভিক্ষু ও কয়েক শো গৃহস্থ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কত ফুল কত পতাকা ও কত রকমের গন্ধদ্রব্য! সে এক বিরাট ব্যাপার! এমন জাঁক করে রাজাকেও বোধ হয় কেউ সম্বর্ধনা করে না।

আনন্দে আগন্তুক লামার বুক বুঝি ফুলে উঠল।

ছেরিঙ বলল: তারপর?

বক্তা নিজেই সব বলতেন। প্রশ্ন শুনে কিছু উৎসাহ পেলেন। বললেন: মৌদ্‌গল্যায়ণের বাড়ি থেকে বিরাট শোভাযাত্রা করে গান গাইতে গাইতে সবাই নালন্দায় এলেন। দ্বারপালদের দুর্দশা সেদিন দেখেছিলাম।

বলেই তিনি চোখ ছোট করে হাসতে শুরু করলেন।

ছেরিঙ ভাবল, এতে হাসির কী আছে? কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। একসময় হাসি সামলে তিনি বললেন: নালন্দার দ্বারপালরা ভাবেন, তাঁরা যেন স্বর্গের দ্বার আগলাচ্ছেন। প্রত্যেকের পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার করে শুধুমাত্র পুণ্যাত্মার জন্যে সেই দ্বার একটুখানি উন্মুক্ত হবে। অবশ্য তাঁরা যে এক একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে কি অমন শক্ত শক্ত প্রশ্ন করা সঙ্গত! লোকে তো শিখতেই আসছে, ঢুকতে দেবার আগেই অমন কড়াকড়ি!

আর একজন বললেন: নালন্দা মহাবিদ্যালয় কিনা, কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাটা অন্যত্র সেরে আসা দরকার।

ছেরিঙ এবারে সাহস করে বলল: দ্বারপালদের কী দুর্দশা হয়েছিল?

লামা আবার একটু হাসলেন, তারপর বললেন: ধর্মগুরুকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগই তারা পেল না। হৈ হৈ করে সবাই তোরণ অতিক্রম করে চলে গেল।

দ্বারপালরা আমাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে?

ছেরিঙ জানতে চাইল।

আগন্তুকদের মধ্যে আর একজন জিজ্ঞাসা করল ভয়ে ভয়ে: কী প্রশ্ন করবে?

অপর আগন্তুক বলল: তাঁদের প্রশ্ন যদি আমরা বুঝতে না পারি?

তিব্বতের লামা বললেন: তার জন্যে ভাবনা কী। আমরা বুঝিয়ে দেব।

এ কথায় সান্ত্বনা কেউই পেলেন না। পরীক্ষার নামে কে না বিচলিত হয়। একজন বললেন: কিছুই বলা যায় না। বিদেশী দেখে দ্বারপালরা হয়তো পথ ছেড়েও দিতে পারেন।

ছেরিঙ খানিকটা আশ্বস্ত হল। সেই সঙ্গে আরও অনেকে।

চীনের লামা বললেন: ধর্মগুরু খুব খাতির পেয়েছেন। কয়েক হাজার বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক তোরণের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। নানাজনে কুশল প্রশ্ন করে ধর্মগুরুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে আমরা তাঁকে উদ্ধার করে সরাসরি স্থবিরের পাশে এনে বসিয়ে দিলাম। আদেশ পেতেই কর্মদান ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে ধর্মগুরু এখন নালন্দায় থাকবেন। আর সকলের মতো এখন থেকে তাঁরও অধিকার থাকবে রন্ধনপাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী যথেচ্ছ ব্যবহারের।

তারপর?

তারপর কুড়িজন মহাপণ্ডিত তাঁকে ধর্মরত্নের কাছে নিয়ে গেলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন: ধর্মরত্নের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

সবাই নির্বাক।

উত্তর প্রশ্নকর্তাই দিলেন: মহাপণ্ডিত শীলভদ্রকে আমরা ধর্মরত্ন বলি। নালন্দার অধ্যক্ষ তিনি, বয়স এখন একশো আট।

পৃথিবীতে এখন তাঁর চেয়ে বড় পণ্ডিত আর নেই।

তারপর নিজের কথাটা বোঝাবার জন্য বললেন: এই নালন্দার বিহারে দশ হাজার পণ্ডিত আছেন যাঁরা সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থের কুড়িটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। তিরিশটি পারেন পাঁচশো জন আর দশজন পঞ্চাশটি। এমন কোন গ্রন্থ নেই যা আমাদের ধর্মরত্ন ব্যাখ্যা করতে পারেন না।

আগন্তুকরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

এবারে আমাদের ধর্মরত্নের কাণ্ডটা শুনবেন?

একজন প্রশ্ন করলেন।

আগন্তুকরা কৌতূহলী হতেই বললেন: কুড়িজন মহাপণ্ডিত ধর্মগুরুকে নিয়ে গেলেন ধর্মরত্নের কাছে। ধর্মরত্নের পাণ্ডিত্যের কথা ধর্মগুরুর খুব ভালই জানা ছিল। কাজেই তিনি সম্মান প্রদর্শনের কোন ত্রুটি রাখলেন না। ধর্মগুরু হাঁটুর উপর ভর করে তাঁর কাছে গেলেন এবং চরণদ্বয় চুম্বন করে মাটিতে মাথা ঠেকালেন। ধর্মরত্ন তাঁকে এমন ভাবে গ্রহণ করলেন যেন কত কালের পরিচিত তাঁরা। কাছে বসিয়ে নানা কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর ডাকলেন তাঁর বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রকে। তিনিও মহাপণ্ডিত। বয়স সত্তর বছর। ধর্মরত্ন তাঁকে সংক্ষেপে বললেন, আমার অসুখের ঘটনা বিবৃত কর। তাঁর আদেশে বুদ্ধভদ্র একটি অলৌকিক ঘটনা শোনালেন। তিন বৎসর আগের একটি ঘটনা। কুড়ি বৎসর যাবৎ ধর্মরত্ন শূলের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে তিনি মৃত্যু ইচ্ছা করলেন। মৃত্যু হল না। কিন্তু রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন। জ্যোতির্ময় আলোকের ভিতর তিনি স্পষ্টভাবে দেখলেন মঞ্জুশ্রী অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়কে। তাঁরা বললেন, তোমার কার্য এখনও শেষ হয় নি। চীনদেশ থেকে তোমার শিষ্য আসছে। তাকে তোমার জ্ঞানদান করতে বাকি আছে। এই বলে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। স্বপ্ন মিথ্যা হতে পারে,

কিন্তু যা সত্য তা নিদ্রাভঙ্গের পরই জানা গেল। এই ঘটনার পর ধর্মরত্ন আর কখনও শূলবেদনায় কষ্ট পান নি। ধর্মগুরু অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, দরদর ধারে তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি ধর্মরত্নের পা জড়িয়ে ধরলেন।

চীনা লামাদের অনেকেই ভাবে গদগদ হলেন। একজন বললেন ঃ আমরা ধর্মরত্নের দেখা পাব তো?

চীনের যে লামাটি অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি হেসেই অস্থির হলেন। বললেন ঃ নালন্দায় ধর্মরত্নই তো সব, তাঁকে বাদ দিয়ে নালন্দার কী রইল!

ছেরিঙ ভাবছিল, এই জন্যই তো তাদের ভাবনা। যত বড়, তার নাগাল পাওয়া তত দায়। চীনের লামা বললেন ঃ ভয় নেই, ধর্মরত্ন নিজেই তোমাদের ডাকবেন।

ভয় হল দূর থেকে নালন্দার বিরাট তোরণ দেখতে পেয়ে। ছেরিঙের বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। সংস্কৃত জানে না, পালি প্রাকৃত ভাষাও না। এখানকার দ্বারপালদের প্রশ্ন বুঝবেই বা কী করে। জবাবই বা কী দেবে? আরও কাছে এসে তারা আশ্চর্য হল। একি! দরজা যে উন্মুক্ত পড়ে আছে! আর অগণিত মানুষ ফুল ও মালা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। এ কি তাদেরই জন্য?

কিন্তু এক জায়গায় গণ্ডগোল কেন? মনে হচ্ছে কাউকে নিয়ে গোলমাল বেধেছে। বুঝি পুরুষ নয়, বুঝি কোন মেয়ে।

সত্যিই মেয়ে। ছেরিঙ স্পষ্ট দেখতে পেল, একটি মেয়ের সঙ্গে দ্বারপালদের বচসা হচ্ছে। মেয়েটি তাদের নির্দেশ বুঝি কিছুতেই মানতে চায় না।

ছেরিঙদের জন্য নালন্দার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। বাধা কেউ দিল না। দিল মালা। কিন্তু ছেরিঙ চমকে উঠল। সে মালা পেয়ে নয়। একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে তাকিয়ে যাকে দেখতে পেল,

তাতে আবার সে চমকাল। মনে হল, এতক্ষণ যে মেয়েটাকে সে দেখতে পাচ্ছিল দূর থেকে, সে বুঝি তাদেরই গ্রামের মেয়ে ছ্যুতেন। কিন্তু এখানে সে কী করে আসবে!

যাঁরা তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন বললেনঃ এ মেয়েটা পাগল। নালন্দায় অধ্যয়ন করবে বলে বায়না ধরেছে।

পাগল বটে, ছেরিঙ ভাবল। তা না হলে মেয়ে হয়ে অধ্যয়ন করতে চায়! ছ্যুতেনের চেয়ে বয়সে বোধ হয় ছোটই হবে। তার সমান হলে লেখাপড়া করতে আর চাইবে না। ছ্যুতেনরা বুঝি সব দেশেই ছড়িয়ে আছে।

॥ ছয় ॥

তোরণের ভিতর দিয়ে গিয়ে ছেরিঙরা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সৌধে পৌঁছল। কী অদ্ভুত ব্যাপার! ছেরিঙ দেখল, এ নাম-গিয়েলের মতো গোম্পা নয়, তাদের গ্রামের মতো কয়েকখানা গ্রাম এক সঙ্গে করলেও নালন্দার ধারণা সম্পূর্ণ হবে না। তাদের দেশে লাসা নামে নাকি একটা বিরাট শহর আছে। তার চেহারা কি এই রকম! আশ্চর্য শুধু ছেরিঙই হয় নি, হয়েছে সবাই! এ যেন শহরের ভিতর শহর, সঙ্ঘারামের ভিতর সঙ্ঘারাম। ছেরিঙ গুনে দেখল, প্রধান সৌধ থেকে সঙ্ঘারাম আটটা ভাগ হয়ে গেছে। ছেরিঙ তাকাল চীনের এক লামার দিকে।

লামা বুঝতে পারলেন যে ছেরিঙ কিছু জানতে চাইছে। আস্তে আস্তে বললেন: কী?

আপনি তো লাসা হয়ে আসছেন: ছেরিঙ ভয়ে ভয়ে বলল: লাসাও কি দেখতে ঠিক এইরকম?

লামা উত্তর দিলেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন।

লজ্জায় ছেরিঙের মাথা কাটা গেল। কিন্তু কেন মাথা কাটা যাবে! সে গ্রামের ছেলে, শহর দেখে নি, দেখে নি এই নালন্দা বিহার। সে কি তার দোষ? গ্রামে না জন্মে সে যদি লাসার চেয়েও বড় শহরে জন্মাত, তা হলে কি সেও হাসত এই সমস্ত লোকের অজ্ঞতা দেখে! এই যদি শহরের নিয়ম হয়, তা হলে একজন আর একজনকে দেখে হাসবে, একজন আর একজনের কথা শুনে হাসবে। আর যিনি সকলকে দেখতে পাচ্ছেন, আর সকলের কথা শুনতে পাচ্ছেন, তিনি হাসবেন সকলের হাসাহাসি দেখে। মানুষের জন্ম তো একটা দুর্ঘটনা! যে ছেলেটা চাষার ঘরে জন্মায়,

সে রাজার ঘরেও জন্মাতে পারত। তাঁদের লামাও তো সাধারণ মানুষের ঘরেই জন্মাচ্ছেন। বুদ্ধও যে আবার জন্ম নেবেন না, তাই বা কে বলতে পারে! যেখানেই জন্মান, তাতে তাঁর বুদ্ধ হতে নিশ্চয়ই কোন বাধা থাকবে না। মেয়ে হয়েও তো জন্মাতে পারেন!

মেয়ে হয়েও জন্মাতে পারেন! ছেরিঙ চমকে উঠল। তাও কি সম্ভব! বুদ্ধ বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বেশিদিন সংসার করেন নি। স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। না না, স্ত্রীকে নয়, তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ছেরিঙ জানে, সংসারের উপর বীতরাগ হয়ে তিনি সন্ন্যাসী হননি, মানুষের দুঃখ দেখে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্যই তিনি মানুষের কাছ থেকে দূরে গিয়েছিলেন। ছেরিঙ ভাবল, তা হলে তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতে আজ বাধা কিসের! কে জানে, হয়তো তিনি মেয়ে হয়েই এবারে জন্মেছেন!

মেয়ের কথায় তার মনে হল সেই মেয়েটার কথা। ছ্যাতেন নয়, নালন্দার সিংহদ্বারে যে মেয়েটিকে দেখেছে, তার কথা। কী দৃপ্ত ভঙ্গি—যেন একটা আগুনের শিখা! অমন রূপও বুঝি সচরাচর চোখে পড়ে না। এত পথ উত্তীর্ণ হয়ে তারা এল, কিন্তু ঠিক এমন মেয়ে তারা কোথাও দেখতে পায় নি।

চলতে চলতে ছেরিঙ একসময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। এত বড় বিহারের ভিতর অমন সুন্দর একটা মেয়ের স্থান হবে না! ছেরিঙের মনে হল, এ কোন্ গভীর অন্যায়। মানুষ মানুষকে কেন বঞ্চিত করবে! নারী বলে, দুর্বল বলে, অসহায় বলে? ছেরিঙ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

দলের একজন তার হাত ধরে আকর্ষণ করল। ছেরিঙ চমকে উঠল, তার ভাবনা গেল এলোমেলো হয়ে।

একজন প্রশ্ন করল: আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

উত্তর এল ঃ স্থবিরের কাছে। কর্মদানের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের আমরা কোন অধিকার দিতে পারব না। আপনাদের ক্ষেত্রে এটা অবশ্য প্রথা রক্ষা।

যথানিয়মে সকলের সঙ্গেই ছেরিঙদের সাক্ষাৎ হল। তিব্বত লামাটি ছেরিঙকে সব কিছুই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। বড় বড় জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতদের কথাও বললেন কিছু কিছু। ধর্মরত্ন শীলভদ্র ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রের কথা আগেই শুনেছিল। ধর্মপাল চক্রপালের উপদেশের কথা বললেন। মনোযোগ দিয়ে তাঁদের উপদেশ শুনলে অবিবেচক সংসারী লোকেরও মোহভঙ্গ হয়। গুণমতি ও স্থিরমতির অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনে বিদেশ থেকেও আজকাল ছাত্র আসছে। প্রভামিত্রের অধ্যাপনা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়। বিষয়বস্তুকে এমন সরল করে বলতে আর কেউ বোধ হয় পারেন না। জিনমিত্র অদ্বিতীয় বাগ্মী। আর অদ্ভুত মানুষ জ্ঞানচন্দ্র। কথাবার্তা ও ব্যবহারে এমন প্রসাদ যে সবাই তাকে আপনজন ভাবে।

ছেরিঙ বলল ঃ ভিতরটা ভাল করে দেখব।

লামা হাসলেন।

হাসলেন যে ?

লামা বললেন ঃ এখানে আমি দীর্ঘদিন আছি। ভাল করে তবু আমার কিছুই দেখা হয় নি।

ছেরিঙ কিছু লজ্জা পেল। বলল ঃ না হয় মোটামুটিই একটু দেখিয়ে দিলেন।

মাথা নেড়ে লামা বললেন ঃ তা দেখাতে পারি। সেই সঙ্গে একটু ইতিহাসও বলা চলে।

ছেরিঙ আগ্রহ প্রকাশ না করে পারল না।

লামা বললেন ঃ এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহ। শহরে পাঁচটি পাহাড়। তারই একটিতে, নাম গৃধ্রকূট, বুদ্ধদেব তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছেন।

বুদ্ধের নির্বাণের ঠিক পরেই নালন্দায় এই প্রথম সঙ্ঘারামটি নির্মাণ করে দিলেন বৌদ্ধ রাজা শক্রাদিত্য। তারপর এই চারটি সঙ্ঘারাম—

লামা দেখাতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বললেন: এটি বুদ্ধগুপ্তের, এটি তথাগত গুপ্তের, বালাদিত্যের এটি, আর এটি তৈরি করে দিয়েছেন মহারাজা বজ্র। এঁরা চারজনেই গুপ্তবংশের সম্রাট।

আর একটি বিরাট সঙ্ঘারামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন: এই সঙ্ঘারামটি নির্মাণ করে দেন কোন্ রাজা, আমি তা বলতে পারব না।

ছেরিঙ আশ্চর্য হয়ে দেখল যে অসংখ্য সৌধ আছে এই সঙ্ঘারামে। অতি উচ্চ ইঁটের প্রাচীর দিয়ে সমস্ত সৌধগুলি পরিবেষ্টিত। অদ্ভুত দৃশ্য। ভাস্কর্য আরও অদ্ভুত! অপরূপ কারুকার্যময় অসংখ্য স্তম্ভ, শৈলশিখরের মতো সৌধচূড়া সূক্ষ্মাগ্র, সারি সারি সুবিন্যস্ত। স্থানে স্থানে বুঝি প্রবাল খচিত।

বিস্ময়াবিষ্ট ছেরিঙ আকাশের দিকে চেয়েছিল।

লামা বললেন: ওই হল পর্যবেক্ষণশালার গম্বুজ। প্রত্যূষের কুয়াশায় ওই গম্বুজ আর প্রকোষ্ঠগুলি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় না।

বললেন: একদিন তোমাকে উপরে নিয়ে যাব।

কেউ বাধা দেবে না?

শিশুর মতো প্রশ্ন করল ছেরিঙ টাশি।

লামা হাসলেন, বললেন: জানলা দিয়ে মেঘের খেলা দেখতে পাবে। আর দেখবে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ।

ছেরিঙ বুঝল, এখানে তার চলাফেরার অবাধ অধিকার। বলল: কারও অনুমতির দরকার হবে না?

লামা আবার হাসলেন।

কিন্তু ছেরিঙ তাঁকে ছাড়ল না, বলল: হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমি গাঁয়ের লোক, কিন্তু গেঁয়ো হয়ে থাকতে চাই না। মূর্খ বলেই তো এখানে এসেছি।

লামা বললেন: কোথায় অনুমতি চাই, আর কোথায় চাই নে, কদিন এখানে থাকলেই তা জানতে পারবে। এমন অনেক লোক এখানে আছেন, যাঁদের কোনখানে যেতেই অনুমতির দরকার নেই।

ছেরিঙ এ কথা বোঝে। অনুমতি দেবার মালিক যাঁরা, তাঁরা তো সব জায়গাতেই যাবেন। কিন্তু তাদের দৌড় কতদূর? সেটুকু জানা থাকলে কাজের সুবিধা হয়। কিন্তু লামার কাছে একটা সদুত্তর না পেয়ে ছেরিঙের মনে হল যে বিধিবদ্ধ নিয়ম বোধ হয় নেই, থাকলেও সকলে তা মানে না। কিন্তু লামা সে কথা ভাববার অবকাশ দিলেন না, বললেন: চল, তোমায় আমি ভিক্ষুদের থাকবার জায়গা দেখাই।

বলে তিনি এক সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণে টেনে আনলেন। চতুর্দিকে সারিবদ্ধ কক্ষ। সৌধ চারতলা। টকটকে লাল রঙের থামগুলি অপূর্ব শিল্পসমন্বিত। রঙিন কার্নিশে ক্ষোদিত কীর্তিমুখ। বারান্দায় ঝালরের রেলিঙ সূক্ষ্ম হাতে ক্ষোদাই করা। একদিকের ছাদ দেখা যাচ্ছিল। লামা সেদিকে ছেরিঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন: দেখ।

উপরের দিকে তাকিয়ে ছেরিঙ আশ্চর্য হল। ঝকঝকে টালির ছাদ, নানা বর্ণে উজ্জ্বল মসৃণ। রবিরশ্মিতে স্ফটিকের মতো বর্ণবিভা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এমন অদ্ভুত দৃশ্য ছেরিঙ কোনখানে দেখে নি।

নালন্দায় কত ভিক্ষু আছেন জান?

লামা জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেরিঙের তা জানা সম্ভব নয়, তাই নীরব রইল।

লামা বললেন ঃ দু হাজার। জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে অসাধারণ তাঁরা, কিন্তু বিনয় ব্যবহারে তৃণাদপি নম্র। ধর্মনিষ্ঠা ও চরিত্রবলে এঁরা দেবতুল্য। এঁদের খ্যাতি দেশে বিদেশে সমান ভাবে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

ছেরিঙের মনে হল, এই নালন্দায় এসে তার জীবন ধন্য হতে চলেছে। সেই পুলকে সে হঠাৎ মূক হয়ে গেল।

লামা বললেন ঃ আমাদের ধর্মগুরু কোথায় ছিলেন দেখবে ?

বলে তিনি এগিয়ে গেলেন।

কোন কথা না বলে ছেরিঙ তাঁকে অনুসরণ করল।

এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেন ঃ এই হল বালাদিত্য রাজার সঙ্ঘারাম। ওই চারতলার উপর থাকেন ধর্মরত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্র। তিনিও বৃদ্ধ। ধর্মরত্নের কাছ থেকে প্রথমে এখানে এসেছিলেন। তারপর এক বছর তিন মাস ছিলেন বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের গৃহের উত্তরে একটি স্বতন্ত্র আবাসে। এই সময় তিনি ধর্মরত্নের কাছে যোগাসন শিখতেন, আর পড়তেন সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র।

একটু থেমে বললেন ঃ ধর্মগুরু এখানে খুব সম্মানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর জন্য একজন উপাসক ও একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়েছিল। তিনি একটি হাতীও পেয়েছিলেন।

হাতী !

ছেরিঙ আশ্চর্য হল।

লামা বললেন ঃ এদেশে অনেক হাতী আছে। উৎসবে শোভা যাত্রায় এমন কি ভ্রমণ ও অন্যান্য অনেক কাজে এখানে হাতীর-ব্যবহার। তুমি তো এদেশে থাকবে, তুমি সবই দেখতে পাবে।

ছেরিঙের মনে হল, এখানে তার চুপ করে দেখা ও শেখাই ভাল। তা হলে তার অজ্ঞতা কমই প্রকাশ পাবে। তাই আর কথা কইল না।

বালাদিত্যের সঙ্ঘারাম থেকে বেরবার সময়ে লামা বললেন: এই বালাদিত্যের বিহার তুশো হাত উঁচু। সম্প্রতি রাজা হর্ষবর্ধন ছেষট্টি হাত উঁচু একটা বিহার তৈরি করে তা পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। সবাই তা সোনার বলে ভ্রম করে।

ছেরিঙকে লামা এক বিরাট বুদ্ধমূর্তির সামনে নিয়ে এলেন। ঝকঝকে তামার দণ্ডায়মান বুদ্ধ। লামা বললেন: চুয়ান্ন হাত লম্বা। রাজা পূর্ণবর্মা এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ছেরিঙের দৃষ্টি বিহ্বল হল। প্রণাম জানাল দেবতাকে।

লামা বললেন: এর উপরের চাতাল দেখ ছ তলার সমান উঁচু।

এক স্থানে অধ্যাপনা হচ্ছিল। পাশ দিয়ে যাবার সময় ছেরিঙ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। দেখল, কী প্রশান্ত গম্ভীর দৃশ্য। বিভিন্ন বয়সের বিদ্যার্থী, কিন্তু কারও মুখে একটি কথা নেই। অপলক দৃষ্টিতে সকলে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেরিঙের বিস্ময় লক্ষ্য করে লামা বললেন: এই রকম অধ্যাপনার স্থান এখানে এক আধটি নয়, একশোটি।

এক—

ছেরিঙ তার বিপুল বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়েও থেমে গেল। মনে পড়ল তার সংকল্পের কথা, নিঃশব্দে সব কিছু দেখে যাওয়া এবং শুনে যাবার কথা।

লামা হেসে বললেন: হ্যাঁ, পুরো একশো। দশ হাজার বিদ্যার্থী প্রতিদিন অধ্যয়ন করছে। এখানে শুধু বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই গ্রন্থ পড়ানো হয় না, সমস্ত শাস্ত্রই পড়ানো হয়। বেদ সাংখ্য চিকিৎসা-বিদ্যা হেতু-বিদ্যা শব্দ-বিদ্যা প্রভৃতি কোন বিদ্যাই বাকি নেই। বৌদ্ধদের আঠারো সম্প্রদায়ের গ্রন্থ, মহাযান, ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের বিচার এখানে সকলে জানেন। না জানা একটা সাংঘাতিক লজ্জার ব্যাপার।

একটু থেমে বললেন: তোমরা বিদেশী বলেই এমন সহজে নালন্দা-প্রবেশের অধিকার পেলে। তা না হলে দ্বারপণ্ডিতদের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। কথোপকথনছলে তাঁদের পরীক্ষা। কিন্তু বিচারের বিষয়গুলি এমনই দুরূহ যে বিদ্যার্থীরা প্রায় সকলেই ফিরে যায়। একশো জনের ভিতর দশ থেকে বিশ জন প্রবেশ করতে পারেন। যাদের অধ্যবসায় কম, তারা দ্বিতীয়বার আর আসে না। যাদের মনোবল দৃঢ়, তারাই আসে বার বার। নালন্দার বাহিরেই সবাইকে বিদ্যার্থী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। নালন্দায় আসে বিশ্ববিশ্রুত হবার অভিলাষ নিয়ে।

ছেরিঙ বলল: আজ আপনার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নেই?

লামা হেসে বললেন: আজ মণ্ডলীর ছুটি, তোমাদের সম্বর্ধনার জন্য ছুটি পেয়েছি। তা না হলে সকাল থেকে রাত্রি অবধি আমাদের নানা বিচারে ব্যস্ত থাকতে হয়।

অকস্মাৎ একটা ঘণ্টার ধ্বনি কানে এল। সেই শব্দে সচকিত হয়ে ছেরিঙ লামার মুখের দিকে তাকাল। লামা বললেন: মধ্যাহ্নের ছুটি। এই ঘণ্টা বাজিয়ে কর্মদান দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সঙ্কেত সবাইকে জানিয়ে দিলেন। জলঘড়ি থেকে আমাদের সময় নির্ণীত হয়।

পিছন ফিরে বললেন: চল, আমরাও ফিরি। আমার সঙ্গে আজ তোমার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে।

আর সকলের?

লামা বললেন: তাঁরা চীন দেশের, চীনের লামা তাঁদের ব্যবস্থা করবেন। তোমাদের স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা কর্মদান যথাসময়ে জানিয়ে দেবেন।

তিব্বতী লামার অনুসরণ করল তিব্বতী যুবক ছেরিঙ টাশি।

॥ সাত ॥

নালন্দা নাম কেন হল, ছেরিঙ জানতে চেয়েছিল। কেউ বলল, এখানে একটি সরোবরে নালন্দ নামে নাগ থাকত, তারই নামে নাম। কেউ বলল, বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে এখানে রাজা ছিলেন। এমন দানশীল ছিলেন যে দেব না বলতে পারতেন না—ন অলং দা। কেউ বলে, নাল মানে পদ্ম, ষণ্ড মানে সমূহ। এমন পদ্মের দেশ বলেই নাম নালন্দ।

প্রথম কিছুদিন এখানকার আহারের ব্যবস্থাটা ছেরিঙের আশ্চর্য মনে হত! নাম গিয়েল গোম্পায় এমন অদ্ভুত খাদ্য সে কোনদিন খায় নি। শিমের বীচির মতো বড় বড় দানার চাল পেয়েছিল, সাদা চকচকে সুগন্ধী চাল। তার সঙ্গে জাম, জায়ফল, সুপুরি আর কর্পূর। কর্মদানের কাছ থেকে একজন লোক এসে দশ সের চাল, একশো কুড়িটা জাম, কুড়িটা সুপুরি, কুড়িটা জায়ফল ও আধ ছটাক কর্পূর এনে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে এক মাসের জন্য তিন প্রস্থ তেল ও দৈনিক খরচের জন্য ঘি ও অন্যান্য নানা জিনিস।

তিব্বতী লামা বললেন ঃ ধর্মগুরুকেও এই সব জিনিষ দেওয়া হত।

ছেরিঙের হঠাৎ দই ছাতুর কথা মনে পড়ল, আর শুকনো মাংস। তিব্বতের মানুষ জাম জায়ফলের বদলে শুকনো মাংস চায়। অনেক লামাও খায় বলে ছেরিঙ গল্প শুনেছে, দেখেছেও দু-এক-জনকে। বড় লামার জন্য নাম গিয়েল গোম্পায় বড় কড়াকড়ি। তাও কি সকলে মানে! কিন্তু ছেরিঙ এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারল না! তার মনে হল, লামা তাকে ভুল বুঝবেন। হয়তো ভাববেন, শুকনো মাংসের জন্য তার মন কেমন করছে। সে যে

মাংস খায় না, সে কথা আর বিশ্বাস করতেই চাইবেন না।

নালন্দায় সারাদিনই অধ্যয়ন অধ্যাপনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি নানা শাস্ত্রের বিচার। ছেরিঙের ক্লান্তি আসে সন্ধ্যাবেলা। মুক্ত আকাশের জন্য তখন তার মন কেমন করে। মনে পড়ে তার দেশের দিগন্তের কথা। কত উদার উন্মুক্ত। এখানে তার দৃষ্টি অবরুদ্ধ। দিগন্ত ঢাকা পড়েছে উঁচু সৌধে ও বিহারে। জানলা দিয়ে অনেকটা আকাশ দেখা যায়, কিন্তু সবটা যায় না। সমস্ত আকাশটা দেখতে না পেলে ছেরিঙ বড় অস্বস্তি বোধ করে। তিব্বতী লামা প্রৌঢ় হয়েছেন। বোধ হয় কিছু বুঝতেও পারেন। তাই সূর্যাস্তের পর তাঁর দ্বিতলের কক্ষ থেকে নিচে নেমে আসেন ছেরিঙের কাছে। বলেন : বেড়াতে যাবে ?

ছেরিঙ এই আহ্বানেরই অপেক্ষা করে থাকে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলে : আপনার অপেক্ষাই আমি করছি।

উত্তরে লামা হাসেন।

ছেরিঙ মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে যে এ রকম হাসিতে সে লজ্জা পাবে না। যাঁরা বয়সে বড়, তাঁরা এমনি হাসি দিয়ে নিজেদের বয়সের বিজ্ঞাপন দেন। তাতে বিচলিত হবার কিছু নেই।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে সেই পুকুরের ধারে এসে পৌঁছলেন। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের উপর নীলপদ্ম ফুটেছে স্থানে স্থানে। দূরের আম্রকাননে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে। ধীরে ধীরে সেই সবুজ হবে কালির মতো কালো। লামা একটি কনক ফুলের গাছের নিচে বসলেন। ছেরিঙও বসল। মাথার উপর লাল ফুলের থোকা মন্দ হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে। ছেরিঙের মনটাও হঠাৎ দুলে উঠল।

হঠাৎ এমন পুলক কিসের ?

লামা বোধ হয় কিছু লক্ষ্য করেছিলেন, তাই প্রশ্নটা জানিয়েই ফেললেন।

ছেরিঙ বেশ লজ্জা পেল। লজ্জা পেল তার ছেলেমানুষির জন্য। এত অল্পেই তার মনের ছায়া পড়ে মুখের উপর! মুখটা কি মনের মুকুর?

ছোট চোখ দুটো আরও ছোট করে লামা বললেন: শকুন্তলার কথা মনে পড়েছে বুঝি?

শকুন্তলা সেই মেয়েটির নাম, প্রথম দিন নালন্দার তোরণে যে মেয়েটিকে সে দেখেছিল, দেখে অভিভূত হয়েছিল। এমন সুন্দর মেয়েও আছে ভারতবর্ষে! আশ্চর্য হয়ে ছেরিঙ ভাবল, এত নজরও আছে বুড়োগুলোর!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লামা একবার ছেরিঙের মুখটা দেখে নিলেন, তারপর বললেন: বিদেশে এসেছ বন্ধু, একটু সমঝে চল।

আমি কোন অন্যায় করেছি?

অন্যায় কর নি? একেই তো অন্যায় বলে!

অন্যায়!

ছেরিঙ ভাবতে পারে নি যে লামা এমন স্পষ্ট অভিযোগ করবেন।

শান্তভাবে লামা বললেন: কেন উত্তেজিত হচ্ছ? একটু সুস্থ হও, আমি তোমায় বুঝিয়ে বলছি।

ছেরিঙ আর উত্তর দিল না। তার নির্বাক দৃষ্টি তুলে ধরল লামার মুখের উপর।

লামা বললেন: এখানে তুমি এসেছ অধ্যয়নের জন্য। সেইটেই তোমার একমাত্র কাজ। পরের কাজে হস্তক্ষেপ করাই অন্যায়।

কেউ ভুল করলেও তাকে তা ধরিয়ে দেব না?

ছেরিঙ প্রশ্ন করল।

লামা বললেন: গায়ে পড়ে কিছুই করবে না। এখন তোমার ভুল ধরবার অধিকার নেই। যখন সেই দায়িত্ব তোমার উপর পড়বে, তখন আবার ভুল না ধরলে অন্যায় করছ বলব।

সংযত ভাবে ছেরিঙ বলল: তা হলে আমিও আপনার অধিকারের প্রশ্ন তুলতে পারি।

লামা যেন হকচকিয়ে গেলেন, বললেন: তা পার বইকি।

তারপরেই সংশোধন করে বললেন: না, পার না।

ছেরিঙ প্রতিবাদ করল: কেন?

লামা বললেন: তুমি শুধু কনিষ্ঠেরই সমালোচনা করতে পার, জ্যেষ্ঠের নয়।

ছেরিঙ বলল: আপনার এই মত প্রগতির অনুকূল নয়। প্রত্যেক মানুষের আছে চিন্তার স্বাধীনতা। ভগবান মানুষকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর এই স্বাধীন চিন্তাকে প্রকাশের অধিকার না দিয়ে জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠের উপর অন্যায় করছেন। আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে ভগবানের কাছে।

ছেরিঙ এসব কী বলছে! লামা বিচলিত হলেন। বললেন: তুমি বুঝি এইসব কথা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ?

ছেরিঙ হাসল, বলল: আমার সব কথা এখনও সবাই বুঝতে পারে না।

বলে বেড়াচ্ছ তো?

বলবার চেষ্টা করছি, বোঝাবার চেষ্টাও।

তারপরেই আগ্রহ প্রকাশ করল জানবার: অনেকে বুঝেছেন বুঝি?

চিন্তিতভাবে লামা মাথা নাড়লেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

আমি তো তাই চেয়েছি: ছেরিঙ খুশী হল: এই কদিনে যতটুকু শিখেছি, ততটুকুই আমি কাজে লাগিয়েছি।

লামা বললেন: কী বলেছ শুনি?

ছেরিঙ বলল: মানুষের জন্মগত অধিকারের কথা বলেছি। জন্ম দিয়েছেন ভগবান। তাঁরই নির্দেশে কেউ পুরুষ ও কেউ নারী হয়ে

জন্মেছে। এই প্রভেদটা প্রকৃতির প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে নয়। তবে কেন মানুষের তৈরি এত বিধি-নিষেধ। কেন বঞ্চনা! নারীর দাবি অস্বীকারে পুরুষের কোন্ অধিকার! কে তাকে অধিকার দিয়েছে!

ছেরিঙ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বাধা দিয়ে লামা বললেন: এসব কথা তোমাকে কে শেখাল?

কেউ শেখাবে কেন! যে-কোন সুস্থ মানুষই তো এ কথা ভাবতে পারে।

গম্ভীর ভাবে লামা বললেন: শকুন্তলার সঙ্গে তুমি কথা বলেছ?

ছেরিঙ উত্তর দিল না।

ভয় পাচ্ছ কেন, উত্তর দাও।

ভয় আমি পাই নে।

তবে বল, কথা বলেছ।

বলেছি। কিন্তু সব কথা তার বুঝতে পারি নি, নিজের সব কথাও পারি নি বোঝাতে।

লামা বললেন: তুমি যা বললে, এ সবই শকুন্তলার কথা।

নিস্পৃহভাবে ছেরিঙ বলল: তা হবে।

তা হবে মানে, শকুন্তলা তো শুনছি এই কথাই সবাইকে বলছে।

ছেরিঙ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: কতদিন থেকে বলছে বলতে পারেন?

লামা ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: সে অনেক দিন হবে। প্রথমবার সে এসেছিল ধর্মগুরু এখানে আসবার আগে। সেবারে দ্বারপণ্ডিতের কাছে তর্কে পরাস্ত হয়ে ফিরে যায়।

এবারে?

ছেরিঙ সোজা হয়ে বসল।

লামা আস্তে আস্তে বললেন : শুনতে পাচ্ছি, এবারে সে পরাস্ত হয় নি। অন্ততঃ মেয়েটা তো তাই সবাইকে বলছে।

ছেরিঙের চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লামা বললেন : বলছে, পুরুষদের মতো সেও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করবে। নানা যুক্তি তার কাছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পড়েছে যত্ন করে। মৈত্রেয়ী গার্গী লীলাবতী প্রভৃতি ভারতীয় মহিলার জ্ঞানের বিবরণ দিচ্ছে মুখে মুখে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ঋষি স্বেচ্ছায় তাঁর স্ত্রীকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছিলেন। নারী বলে তাঁকে তো তিনি উপেক্ষা করেন নি। তার আগে কাশীরাজ-কন্যা গার্গীর সঙ্গেও শাস্ত্রালোচনা করেছিলেন।

ছেরিঙ বড় বড় চোখে তাকাল লামার দিকে।

লামা থামলেন না। বললেন : তারপর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী। পিতার কাছে পুত্রের মতো শিক্ষা পেয়ে তিনি পিতার সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের লীলাবতী অধ্যায় যোগ করেছেন। লীলাবতী গণিতের পণ্ডিত ছিলেন।

ছেরিঙের বিস্ময় যেন ধরে না। ভারতীয় মহিলার কথা সে আরও শুনবে। বলল : তারপর ?

তারপর : লামা হাসলেন, বললেন : তারপর দেবাহুতি, মদালসা, লোপামুদ্রা। সকলের সব কথা আমি জানি না।

ছেরিঙ বলল : শকুন্তলা নিশ্চয়ই জানে!

লামা স্বীকার করলেন : তা জানে। তারই মুখে এই সব শুনতে পাচ্ছি।

তবে কেন তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না ?

ছেরিঙ প্রশ্ন করল ছেলেমানুষের মতো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লামা বললেন : এ কথার উত্তর আমি দিতে পারব না।

কিন্তু ছেরিঙ উত্তর চায়, বলল: তবে কাকে আমি এই প্রশ্ন করব?

লামা বললেন: কাউকে না।

কেন?

ছেরিঙ তাঁর উপদেশ মানতে রাজী নয়।

লামা গম্ভীরভাবে বললেন: যদি নিজের মঙ্গল চাও তো এসব প্রশ্ন নিজের মনেই চেপে রাখ।

এমন ভীরু হতে আমায় বলবেন না।

ছেরিঙ অনুনয় জানাল।

লামা উত্তর দিলেন: ভীরুতা নয়, এ বিনয়। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানে থাকতে হলে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ সবাইকে মেনে চলতে হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে ছেরিঙ বলল: হুঁ।

চারিদিকের আম্রকাননে দীর্ঘছায়া অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। মাথার উপরে যে ফুলের থোকা বাতাসে দুলছিল, তার রঙ আর লাল নেই। মনে হচ্ছে যেন কয়েকটা বাদুড় মুখ নিচু করে দুলছে। পৃথিবীটা থম থম করছে। নিজের চারিপাশে একবার চেয়ে দেখে লামা বললেন: চল, এবারে ফেরা যাক।

ছেরিঙ নিঃশব্দে তাঁর অনুসরণ করল।

॥ আট ॥

ঘরের ভিতর ছেরিঙ টাশির হাত নিসপিস করে। অনেকদিন সে কোন ছবি আঁকে নি, মূর্তিও গড়ে নি। নাম গিয়েল গোম্পা থেকে বেরিয়ে এসে এসব কথা ভাববারই সে অবসর পায় নি। সারাক্ষণ বড় ব্যস্ততা, বড় চিন্তা-ভাবনা।

নালন্দায় সকালের ঘুম ভাঙ্গে ঘণ্টার শব্দে। দশ হাজার বিদ্যার্থী এক সঙ্গে ওঠে ঘুম থেকে। ওঠে অধ্যাপক ও ভিক্ষু মণ্ডলী। নানা দলে বিভক্ত হয়ে সবাই সরোবরে যায় স্নানের জন্য। একটি দুটি নয়, আম্রকাননের ভিতর অনেকগুলি সরোবর। সেই সরোবরে সবাই স্নান করে।

তখন ভারে ভারে নানা সম্ভার নিয়ে গ্রাম থেকে আসে গ্রামবাসী। দুশো মানুষ। ঘি দুধ চাল জাম জম্বীর আরও কত জিনিস। রাজা গ্রাম দিয়েছে। সেই গ্রামের ফসল। রাজার খরচে নালন্দা চলে। বড় বড় বিহার চলে। শিক্ষার্থীরা শুধু হাতে আসে, মন ভরে নিয়ে যায়। কিন্তু সবাই ঢুকতে পায় না। দ্বারে মহাপণ্ডিত দ্বারপালরা আছেন। শাস্ত্রবিচারে তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারলেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। শকুন্তলা নাকি সন্তুষ্ট করেও ঢুকতে পায় নি। কিন্তু কেন ঢুকতে পাবে না

এ নিয়ে অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। বেদাধ্যয়নে নারীর অধিকার নেই? কেন নেই? কে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে? আজ যদি শকুন্তলার দাবি মানতে হয় তো কার কাছে তাকে আবেদন করতে হবে? মহাস্থবির ধর্মরত্ন কি এই আবেদন শুনে উদাসীন থাকবেন! তাঁর কানে কি শকুন্তলার কথা এখনও পৌঁছয় নি!

ছেরিঙের মনে পড়ল, নাম গিয়েল গোম্পার বড় লামার কথা। ছেরিঙ তাঁর কাছে নানা সমস্যা নিয়ে গেছে। তিনি কোনটারই উত্তর দেন নি, শুধু হেসেছেন। এখানকার মহাস্থবিরও কি ঠিক তেমনি করে হাসবেন! কিন্তু কেন এঁরা হাসেন? কেন এঁরা কোন সমস্যাকেই আমল দিতে চান না? বুড়ো হলেই কি এমন রক্ষণশীল হতে হয়!

সারা দিনমানে এসব কথা ভাববার অবকাশ ছেরিঙ পায় না। কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে যায়, সে তা বুঝতেই পারে না। অধ্যয়নের একটা নেশা আছে তো! এই নেশাতেই বিদ্যার্থীরা মাতাল হয়ে থাকে। শকুন্তলার কথা মনে পড়ে ছুটির পর। সেও নাকি সারাদিন দ্বারপণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে। ক্লান্ত মনে ঘরে ফিরে যায় সন্ধ্যাবেলায়। নিকটে এক ধনী গৃহস্থের গৃহে সে আশ্রয় পেয়েছে। নালন্দায় না ঢোকা পর্যন্ত কাউকে সে অব্যাহতি দেবে না।

শকুন্তলাকে ছেরিঙ অনেকবার দেখেছে। কথাও বলেছে তার সঙ্গে। সে শুধু ভাব বিনিময়। সব কথা বুঝতে বা বোঝাতে পারে নি। তবু তারা অনেক কথা বলেছে। ছেরিঙ বুঝিয়েছে যে শকুন্তলার দাবি সে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। আর শকুন্তলাও বুঝেছে যে একটি বিদেশী যুবক যা এত সহজে মেনে নিচ্ছে, তা দেশের এতগুলো মানুষ যেন বুঝেও বুঝছে না। কিন্তু শকুন্তলা তাদের বোঝাবেই।

জ্ঞানমিত্র কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল, ছেরিঙ জানতে পারে নি। টের পেল তার কথা শুনে। জ্ঞানমিত্র আশ্চর্য সুরে বলল: এ কী করছ?

ছেরিঙ চমকে উঠল। এ কী করছে সে! কলমের খোঁচায় দেওয়ালটা যে বিচিত্র করে ফেলেছে। শুধুই আঁচড়, কালি ব্যবহার করে নি। জ্ঞানমিত্র মনোযোগ দিয়ে সেই আঁচড়গুলো পরীক্ষা

করল। বলল ঃ তোমার হাত তো ভাল, তুমি কি ছবি আঁকতে ?

ছেরিঙ ছবি আঁকত, মূর্তিও গড়ত। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। জ্ঞানমিত্র বুঝতে পারল যে ছেরিঙ টাশি গভীর ভাবে কিছু ভাবছিল। মন তার অন্য জগতে ছিল, এখনও ঠিক এই ঘরের ভিতর ফিরে আসে নি। চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসতে কিছু সময় লাগে বইকি! জ্ঞানমিত্র ছেরিঙকে সেই সময় দিল।

তিব্বতী লামার মতো জ্ঞানমিত্র বয়োবৃদ্ধ নয়। সে ছেরিঙেরই বয়সী, তবে ভারতীয় বৌদ্ধ। শুধু যে পাশের ঘরেই থাকে তা নয়, অল্প কয়েকদিনেই তার মনের পাশেও একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। এটা বোধ হয় বয়সের ধর্ম। ভাষার বাধা দিনে দিনে তাদের কমে আসছে। ভাব বিনিময়ে এখন আর তত কষ্ট নেই। কতকটা সহজ ভাবেই তারা কথা বলে। সেই আঁচড়গুলোর দিকে চেয়ে জ্ঞানমিত্র হঠাৎ চমকে উঠল, বলল ঃ তুমি কি শকুন্তলার ছবি আঁকছ ?

শকুন্তলার !

ছেরিঙ নিজেও আশ্চর্য হল। অন্যমনস্ক ছেরিঙ কি তা হলে নিজের অজ্ঞাতসারেই শকুন্তলাকে রূপ দিচ্ছিল !

জ্ঞানমিত্র তার আরও কাছে সরে এল। বলল ঃ কাউকে যদি না বল তো একটা খবর তোমাকে দিই।

ছেরিঙ কোন উত্তর দিল না, শুধু দৃষ্টিতে অভয় দিল।

জ্ঞানমিত্র বলল ঃ শকুন্তলা নাকি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে যে বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছিল, শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীতে কোন প্রভেদ হত না।

ছেরিঙ কৌতূহলী হল। বলল ঃ প্রমাণ করেছে ?

করেছে বইকি ঃ উত্তর দিল জ্ঞানমিত্র ঃ বেদের শ্লোক উদ্ধৃত

করে প্রমাণ করেছে। আমি সে সমস্ত শ্লোক তোমাকে বলতে পারব না।

ছেরিঙ সংস্কৃত জানে না, শিখতে শুরু করেছে মাত্র। বলল: তার অর্থ আমাকে বল।

জ্ঞানমিত্র বলল: বেদে ব্রহ্মবাদিনী শব্দ আছে, তাঁদের লেখা শ্লোকও আছে অনেক। এই সব ব্রহ্মবাদিনী শিক্ষিতা মহিলা, যাঁরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করে বিবাহ করেন নি। যাঁরা বিবাহ করে সংসারী হয়েছেন, তাঁদের নাম সদ্যোবধূ।

ছেরিঙের চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল: তারপর?

জ্ঞানমিত্র অত্যন্ত সাবধানে বলল: এ কথাও প্রমাণ করেছে যে কোন ধর্মানুশাসনে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ হয় নি। এটা এ যুগের পুরুষের জবরদস্তী। শকুন্তলা এই অন্যায় কিছুতেই সইবে না।

এ কথা এমন ভয়ে ভয়ে কেন বলছ?

এসব খুব সাবধানে বলবার কথা। আমরা বিদ্যার্থী, শুধু অধ্যয়নের জন্য এসেছি। এ সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার যে আমাদের নেই।

আলোচনার অধিকারও কি নেই?

এসব আলোচনা করে কী ফল হবে বল?

উৎসাহ ভরে ছেরিঙ বলল: এসব অন্যায়ের কথা আমরা ধর্ম-রত্নের কানে তুলব।

তা হলে ভুল করবে। নালন্দার পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের কোন মতামত থাকা উচিত নয়।

ছেরিঙ আপত্তি জানাল, বলল: এইটেই তো আমার প্রশ্ন। কেন আমাদের মতামত থাকবে না, কেন আমরা তা প্রকাশ করতে পারব না?

জ্ঞানমিত্র বলল: তোমার গোড়ায় ভুল হচ্ছে বন্ধু। আমরা

এখানে বিদ্যার্থী। বিদ্যার্জনে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের নয়।

দরজার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে আরও আস্তে আস্তে বলল : মতামত যদি কিছু থাকে, তা হলে ওই সদর দরজার বাইরে গিয়ে বলব।

ছেরিঙের এ কথা পছন্দ হল না। বলল : তুমি কাপুরুষ।

ক্ষুব্ধ ভাবে জ্ঞানমিত্র বলল : তোমার বীরপুরুষ নাম ইতিমধ্যে ছড়াতে শুরু হয়েছে। তুমি দেখে নিও, তার ফল খুব ভাল হবে না।

আমি ভয় পাই নে। ধর্মরত্নকে আমি এ কথা জানাব। তাঁর জানা দরকার।

জ্ঞানমিত্র বলল : তিনি যে জানেন না, তা তুমি জানলে কী করে ?

জ্ঞান মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে। তাঁর মতো জ্ঞানী পুরুষ কখনও অনুদার হতে পারেন না।

তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ধর্মরত্ন এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির, অধ্যক্ষ তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এখানে বড় নয়। নালন্দার মঙ্গলের জন্য অন্যায় করতে তিনি নিশ্চয়ই দ্বিধা করবেন না।

ছেরিঙ ঠিক এভাবে চিন্তা করে না। তাই সহসা এ কথার জবাব দিতে পারল না।

জ্ঞানমিত্র এবারে ফিসফিস করে বলল : শুনলাম মেয়েটা নাকি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

আমার কথা ?

হুঁ। নামটা তোমার মনে রাখতে পারে নি, বলছিল সেই তিব্বতী বিদ্যার্থীকে একবার ডেকে দিতে।

আমাকে তো কেউ ডাকে নি।

জ্ঞানমিত্র বলল : ডাকবে কে ! দ্বারপণ্ডিতেরা যে ভাবে চোখ রাঙালেন, মেয়েটাই নাকি ঘাবড়ে গিয়েছিল।

ছেরিঙ বিশ্বাস করল না, বলল : উঁহু, ঘাবড়াবার মতো মেয়েই সে নয়। নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝিয়েছে।

সেই সঙ্গে যোগ করল : আমি নিজেই কাল যাব।

সর্বনাশ : জ্ঞানমিত্র ভয় পেল : তা হলে আমারও রক্ষা থাকবে না।

তোমার কী দোষ ?

আমিই যে তোমায় খবরটা দিলাম। এ কথা কি গোপন থাকবে !

ছেরিঙ তাকে অভয় দিল, বলল : আমি তো কাউকে বলব না।

জ্ঞানমিত্র এ কথায় আশ্বাস পেল না, বলল : তুমি না বললে কী হবে ! সবাই তো জানে যে আমিই তোমার কাছে বেশি যাতায়াত করি !

তাতে ভয় পাবার কী আছে ?

জ্ঞানমিত্রের উত্তর দিতে সময় লাগল না, বলল : তাড়িয়ে দেবে।

ছেরিঙ একটা ভেংচি কেটে বলল : দিক তাড়িয়ে। তাই বলে অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করব না।

জ্ঞানমিত্র একবার বাহিরটা দেখে এল। তারপর খুব ঘনিয়ে এসে বলল : কী শুনেছি জান ?

ছেরিঙ কৌতূহলী হয়ে বলল : কী ?

জ্ঞানমিত্র বলল : অনেক দিন আগে একবার এই ধরনের কথা উঠেছিল। তারপর—

ছেরিঙ স্পষ্ট দেখতে পেল, জ্ঞানমিত্র শিহরে উঠল।

তারপর কী ?

জানতে চাইল ছেরিঙ টাশি।

জ্ঞানমিত্র বলল : যারা এই কথা তুলেছিল, নালন্দায় তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাচ্ছিল্যের সুরে ছেরিঙ বলল : তাড়িয়ে দিয়েছিল, এই তো।

জ্ঞানমিত্র বলল : না না, লোকে অন্য কিছু সন্দেহ করে।

খুন ?

ছেরিঙ তার নিজের সন্দেহ প্রকাশ করল।

ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে জ্ঞানমিত্র বলল : চুপ।

বাহিরে কারও পদশব্দ শোনা গেছে।

॥ নয় ॥

চোরের মতো জ্ঞানমিত্র পালিয়ে গেছে। একটুখানি পদধ্বনি, তাই শুনেই লোকটার সমস্ত সাহস গেল ফুরিয়ে। দম বন্ধ করে ঘরের কোণে অপেক্ষা করছিল। অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে। অনেকক্ষণ পরে ইশারায় ছেরিঙকে বাহিরটা দেখতে বলেছে। কেউ নেই জেনে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে।

ছেরিঙের হাসি পায়। এ দেশের মানুষগুলো এমন ভীরু! তিব্বতে মেয়েদের সাহসও বুঝি এর চেয়ে বেশি। একটা জ্যান্ত মানুষের পেটে ছুরি ঢোকানো হয়েছে দেখলে বাটি নিয়ে ছুটে আসে। তাজা রক্ত ধরবে। ছাগলের তাজা রক্ত মেখে ছাতু খেয়েছে, তার আস্বাদ তো অমৃতের মতো। মানুষের রক্ত নিশ্চয়ই আরও মিষ্টি হবে। এ সব অবশ্য পাশবিক প্রবৃত্তি। ছেরিঙ এই হিংসাকে সমর্থন করে না, কি ভীরুতাকে ঘৃণা করে। সাহস তো হিংসার নামান্তর নয়। মানুষ অহিংস থেকেও সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষাই তো তাই।

ঘরের ভিতর ছেরিঙের বড় গুমোট মনে হল। এতগুলো ছোট ছোট ঘর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে, কিন্তু প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা হয় নি। তাদের নাম গিয়েল গোম্পায় ঘরগুলো বোধ হয় আরও অন্ধকার, আরও স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু সেখানে গুমোট মনে হয় না। সেই হাড়-কাঁপানো শীতের ভিতর বন্ধ গুহার পরিবেশটুকু ভালই লাগে। বাহিরে যখন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় বয়, তখন ইয়াকের ঘুঁটের একটুখানি আগুন আর মাখনের প্রদীপ ঘরের ভিতর নেশা ঘনায়। এ দেশে নেশা আছে ঘরের

বাহিরে প্রকাণ্ড আকাশের নিচে, জ্যোৎস্নালোকে, দক্ষিণের বাতাসে, আর—

ছেরিঙ চমকে উঠল। হঠাৎ শকুন্তলার নাম কেন মনে এল! সে মেয়েটারও কি নেশা আছে! জাদু জানে! কিন্তু তা তো মনে হয় না। জাদু যদি জানবে তো এতদিন বাহিরে কেন পড়ে আছে। সবাইকে বশ করেই তো ভিতরে আসতে পারত।

কিন্তু নেশা নিশ্চয়ই আছে। তা না থাকলে আজ সমস্ত নালন্দার সকলের মুখে তার নাম কেন! ভীরু যারা, তারা মুখ বুজে আছে। তাদের মন তো দেখা যায় না। দেখা গেলে সত্যটা ধরা পড়ত।

মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। বোধ হয় একখানা ঝকঝকে মুকুর। সব সময় সব কিছুর প্রতিবিম্ব পড়ে। ভালরও যেমন, মন্দেরও তেমনি। চেষ্টা করেও কিছু গোপন করবার উপায় নেই। মন্দটা দেখতে না চাইলেও দেখতে বাধ্য হয়। বীভৎসটাও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। নিজের চেহারা দেখেও অনেক সময় ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়। এই মুকুরের মুখোমুখি আছে বিবেক। বাহিরের খোলস দেখে যে ভোলে না। মনের মুকুরে ভাল করে প্রতিবিম্ব দেখে তবে সে বিচার করে।

ছেরিঙ মানুষের সাধনার কথা ভাবে, তার তপস্যার কথা। তপস্যায় মোহভঙ্গ হয় মন নির্মল হয় উদার হয়। সুকর্ষিত মন নিষ্কলুষ। যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় তার অপরূপ রূপ। সে রূপের দীপ্তি আছে, বাহিরের প্রকাশ তার অনিবার্য। মানুষ তাঁদের আর মানুষ বলে না, বলে মহাপুরুষ। কালান্তরে তাঁরা অবতার, যুগান্তরে দেবতা। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। আত্মার সাধনা যতদিন থাকবে, দেবতার সংখ্যা বাড়বে ততদিন।

নালন্দার এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে ছেরিঙ অনেক মানুষ দেখেছে, কিন্তু মহাপুরুষের সন্ধান পায় নি। যে মন মোহমুক্ত সংস্কারমুক্ত,

যে মন স্নেহে ও ক্ষমায় উদার, তেমন মনের অধিকারী মানুষ হয়তো এখানে আছেন। কিন্তু ছেরিঙ তাঁদের পরিচয় পায় নি। যাদের সে দেখেছে ও চিনেছে, তারা তারই মতো সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মানুষ। প্রাণের দাবির চেয়ে সংস্কারের মোহই তাদের কাছে বড়। সত্যে তাদের বিশ্বাস নেই, সংস্কারকে তারা শ্রদ্ধা করে সত্য মনে করে। তা না হলে শকুন্তলাকে কেন ভয় পাবে।

সে তো শকুন্তলাকে ভয় পায় না। বরং তাকে তার ভাল লেগেছে। মেয়েটা শুধু সুশ্রীই নয়, কেমন একটা আকর্ষণ আছে। তা না হলে নালন্দার এতগুলো লোক আর তাঁর কথা ভাবছে!

শকুন্তলাকে সে ভাল করে দেখেছে শুধু একবার। শকুন্তলাও তাকে ভাল করেই দেখেছে। দেখেছে বলেই আজ তার খোঁজ করেছে। নালন্দায় আছে হাজার হাজার মানুষ। তার ভিতর তাকে সে খোঁজ করেছে, ছেরিঙের হঠাৎ গৌরব বোধ হল। ইচ্ছে হল, তখনি সে শকুন্তলার কাছে ছুটে যায়।

কিন্তু এই কারাগারের বাহিরে যাবার অনেক বাধা, বিপত্তিও অনেক। এখন তাকে বাহিরে যেতে কেউ দেবে না। হয়তো কোন সময়েই দেবে না। শকুন্তলার সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা সবাই জেনে গেছে। যারা জানত না, এতক্ষণে তাদেরও হয়তো আর কিছু অজ্ঞাত নেই। শকুন্তলা নিজে খোঁজ করেছে, সবারই তো সে সংবাদ জানা উচিত।

শকুন্তলার সব কথা সে বুঝতে পারে নি। বোঝা সম্ভব নয়। ভারতবাসীরা নাকি নিজেদের ভাষাই নিজেরা বোঝে না। এত বড় দেশ, এত ভাষা যে এ দেশের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কোন মিল নেই। অন্য দেশ বললেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু শকুন্তলা ঠিক বুঝেছিল যে সে ভারতবর্ষের লোক নয়। সে এসেছে হিমালয়ের ওপার থেকে। ছেরিঙ জানতে চেয়েছিল, কী করে বুঝলে।

উত্তর দেবার সময় শকুন্তলা হেসেছিল, কী বলেছিল ছেরিঙ তা ঝতে পারে নি। আরও একটুখানি হেসে সে তার নাক দেখিয়েছিল।

ছেরিঙ খুশী হয় নি। এমন থ্যাবড়া নাক তো আরও অনেকের আছে। হিমালয়ের ওপারে কেন তার দক্ষিণেও অনেক দেশ আছে, যেখানকার লোকদের নাক থ্যাবড়া। শকুন্তলা তাকে নাকের জন্য ঘেন্না করবে, এ কথা জেনে সে খুশী হয় নি।

তারপরেই সে জিজ্ঞাসা করল: তিব্বত না চীন?

গম্ভীরভাবে ছেরিঙ বলল: তিব্বত।

তার পরের প্রশ্নটা ছেরিঙ অনুভবে বুঝেছে। বুঝেছে, শকুন্তলা তাদের দেশের কথা জানতে চাইছে। তাদের দেশে কি এমন বিশ্ববিদ্যালয় নেই! থাকলে তারা এত দূর দেশে এত পরিশ্রম করে আসবে কেন!

তোমরা তো দু-একজন আস, আর সবাই কী করে?

কী আর করবে, মঠের ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ কারও ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

মেয়েরা কী করে, শকুন্তলা জানতে চেয়েছিল।

ছেরিঙ বলেছিল: তাদের কোন দুঃখ নেই। মাঠেঘাটে খেলা-ধূলা করে বড় হয়, সংসারের কাজ শেখে, তারপরে বিয়ে হয়ে গেলে নিজেরাই সংসার পাতে। তাও একটা পুরুষের সংসার নয়, এক সঙ্গে অনেকগুলো পুরুষের। একটা পরিবারের সমস্ত পুরুষেরই সে স্ত্রী হবে।

এ কথা বলবার সময় ছেরিঙ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। শকুন্তলা বুঝতে পেরেছে যে এই জীবন তার পছন্দ নয়।

শকুন্তলা শুনতে চাইল: তারপর?

ছেরিঙ তার আগের কথা জানে। প্রতিবেশীর একটা মেয়ে তার খেলার সঙ্গী ছিল। তাকে দেখে মেয়েটারও পড়বার শখ হত।

বলত, তার সঙ্গে সেও মঠে যাবে, সেও লেখাপড়া শিখবে। ছেরিঙ যখন মঠে গেল, তখন মেয়েটাও আবদার শুরু করল। বাপ-মায়ের কাছে মার খেল জেদের জন্য। শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি, কুরুক্ষেত্র। সে শুধু কয়েক দিন। তারপরেই বুঝে গেল যে লেখাপড়া তার জন্য নয়। তার মা দিদিমা পড়ে নি, পড়ার দরকার হয় নি। না পড়লে তারও চলে যাবে। বরং অনেক সুখের হবে জীবনটা।

ছেরিঙের মনে পড়ে, অনেক দিন পরে একবার এই মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সে তখন দিব্যি বড় হয়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পাকা। মেয়েটা নিজেই সেই খবর দিয়েছিল খুশীতে উচ্ছল হয়ে। বলেছিল, তার রোজগেরে স্বামী হবে চারটে, আর একটাও শীঘ্র রোজগার করবে।

এরা তিব্বতের মেয়ে। এদের গল্প শুনিয়ে ছেরিঙ বলেছিল: এবারে তোমাদের দেশের কথা বল।

শকুন্তলা যা বলেছিল, তার সবটুকু সে বোঝে নি। এইটুকু বুঝেছিল যে এ দেশে এতটা নয়। মেয়েরা লেখাপড়া করে। সকলে না করুক, অনেকেই করে। অন্ততঃ সমাজ তাতে বাধা দেয় না। বাধা শুধু এইখানে। এটুকু ভেঙে দিতে পারলেই শকুন্তলা তার জীবন সার্থক ভাববে।

আর বিয়ে? ছেরিঙ জানতে চেয়েছিল।

শকুন্তলা বলল: বিয়ে এদেশে একটাই হয়। একটা মেয়ের একটা স্বামী। পুরুষেরা সব সময় এ নিয়ম মানে না। একটার বেশিও বিয়ে করে।

ছেরিঙ খুশী হয়েছিল এই নিয়মের কথা শুনে। ভেবেছিল, এই সব কথা সে তিব্বতে ফিরে গিয়ে প্রচার করবে। ধর্ম যেমন জীবনের শেষ কথা, সমাজের তেমনি নীতি। জীবন বাদ দিলে যেমন সমাজ হয় না, তেমনি নীতির প্রয়োজন ধর্মের অনুশীলনে।

তিব্বতে ধর্মচিন্তা আছে, কিন্তু নীতিবোধ বড় দুর্বল। অন্তত ছেরিঙের কাছে এই কথা বারবার মনে হয়েছে।

শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করেছিল : কী ভাবছ?

ছেরিঙ উত্তর দিল : তোমার কথা।

আমার কথা!

শকুন্তলা আশ্চর্য হয়েছিল তার উত্তর শুনে।

ছেরিঙ বলল : তোমার কথাই তো ভাবব। এখন নয়, সারাক্ষণ ভাবব। এখানে নয়, সবখানে ভাবব। যতদিন তোমাকে না ভিতরে নিতে পারছি, ততদিন আমি অন্য কিছু ভাবব না।

এমন অদ্ভুত কথা শকুন্তলা কারও মুখে শোনে নি। বলল : তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ছেরিঙ বলল : এখন পারবে না। কিছুদিন একসঙ্গে থাকবার পর সবই বুঝতে পারবে।

ছেরিঙের মনে হচ্ছিল নাম গিয়েল গোম্পার কথা। সে মঠে কোন মেয়ে আসতে চায় নি, সেই চেয়েছিল মেয়ে আনতে। পুরুষ ও নারী নিয়ে যে বিরাট সংসার, তাতে এক পক্ষ চিরকালই পিছিয়ে থাকবে, এ তার ভাল লাগত না। নারী কেন পুরুষের ভার হয়ে বাঁচবে, তার ভারবাহীই বা কেন হবে! জোয়ালে যদি গলা দিতে হয় তো দুজনেই দেবে, দুজনেই টানবে সমান যত্নে। দুজনেরই দায়িত্ব হবে সমান।

ছেলেবেলায় যখন সে এই কথা বলত, তখন বড় লামা শুধু হাসতেন। বড় হয়ে ছেরিঙ তাঁকে ছেড়ে দেয় নি। জোর করে উত্তর আদায় করেছে। কিন্তু সে উত্তর ছেরিঙের মনোমত হয় নি। তিনি বলেছেন, আমরা আর কদিন আছি! তারপরে তো তোমাদেরই ব্যবস্থা।

তাঁর বোধ হয় দোষ নেই। মানুষ এমনি করে সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে। সংস্কারে তার বড় মায়া, বড় বিশ্বাস। পিছনে

যুক্তি, ধর্মের মতো অন্ধ ভক্তি। চারিদিকে যখন বিদ্রোহ ওঠে, *প্রবীণরা চোখ বোজে, কানে আঙুল দেয়। যখন বিশ্বাসের ভিত* নড়ে ওঠে, ভয় হয় ভেঙে পড়বার, তখন বালির ভিতর মুখ গুঁজে ভাবে, তাকে যেন দেখতে না হয়, লোকে যেন জানতে না পায় সে দেখছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে জীবনের শেষদিনের। বড় লামার কথায় ছেরিঙ এই দুর্বল মনোভাবের পরিচয় পায়। দুঃখও পায়।

শকুন্তলার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ছেরিঙ খুশী হয়েছে। এই মেয়েটা যদি সফল হয়, তার চেষ্টাও সার্থক হবে। ভারতবর্ষ থেকে অনেক কিছু তাদের দেশে গেছে। এই প্রগতির কথাও যাবে। আজ না যাক, আর একদিন যাবে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শকুন্তলা বলেছিল : কী ভাবছ ?

তোমার কথা।

শকুন্তলা বলল : এখনও আমার কথা ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে ছেরিঙ বলল : তুমি আমায় এ দেশের ভাষা শেখাতে পারবে ?

শকুন্তলা হেসে বলল : কী করবে তা হলে ?

গর্বের সুরে ছেরিঙ বলল : নতুন নালন্দা গড়ব। তুমি হবে সেই নালন্দার ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

খিলখিল -করে শকুন্তলা হেসে উঠল। বলল : মহাস্থবির হতে আমি পারব না।

ছেরিঙ লজ্জা পেয়েও যেন লজ্জা পেল না। বলল : কিছু না হয় নাই হলে। পড়াতে পারবে তো ? দেশের সমস্ত মেয়েদের আমরা তোমার মতো তৈরি করব।

হাসতে হাসতে শকুন্তলা বলল : তোমার মতে আমি তা হলে একজন আদর্শ মেয়ে !

ছেরিঙ ঠিক এমন প্রশ্নের আশা করে নি। একটু বিব্রত বোধ

করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু উত্তর দিল সহজভাবে : আমার আদর্শ একটু নিচু।

উত্তর শুনে শকুন্তলা প্রচুর খুশী হয়েছিল। লোকটার বুদ্ধি আছে। কথাগুলোই যা একটু বেয়াড়া। বুঝতে রীতিমত কষ্ট হয়। বলতে ছেরিঙের আরও কষ্ট হয়েছে।

বেশিক্ষণ গল্প করবার সুযোগ ছিল না। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করেছিল : আবার কবে দেখা হবে ?

উত্তরে ছেরিঙ বলেছিল : তাড়াতাড়ি।

কিন্তু তখন সে জানত না যে তার বাহিরে মেলামেশা কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন না, বাহিরে যাবার অবাধ অধিকার তার নেই। মন টানলেও দেহ পড়ে থাকে। আজ তার মন আরও বেশি করে টানছে। শকুন্তলা যে তার খোঁজ করেছে।

ছেরিঙ তার ঘরে থাকতে পারল না। ঘর থেকে কখন যে বেরিয়ে এসেছে, তা আর মনে পড়ে না। নিজের কথা তার মনে পড়ল সেই সরোবরের ধারে পৌঁছে। ছেরিঙ অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে এসে সেই কনক ফুলের গাছের নিচে বসেছে।

নীল জলের পিছনে সবুজ আম্রকানন এখন আর সবুজ নয়। আকাশের রঙও এখন কালো মনে হচ্ছে। তারই সঙ্গে মিলে আছে নালন্দার লাল প্রাচীর। সবটা দেখা যায় না, একটি অংশ মাত্র দেখা যাচ্ছে। ছেরিঙ সেই প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে তার বাহিরের পৃথিবীর কথা ভাবতে লাগল। সেখানে মুক্ত দিগন্ত আছে, স্বাধীনতা আছে, আর আছে শকুন্তলা। বাহিরে থাকলে আজ তাকে এই গাছের নিচে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হত না।

আকাশে আজ চাঁদ নেই, এখনও চাঁদ ওঠে নি। তারার আলো আকাশেই ফুরিয়ে গেছে। সরোবরের জল আম্রকানন আর নালন্দার প্রাচীর মিলে গেছে এক হয়ে। ছেরিঙের তবু মনে হল, এই অন্ধকারের ভিতরেও কিছু সে দেখতে পাচ্ছে। দু চোখের

দৃষ্টিকে আরও সংহত করে দেখল, প্রাচীরের নিচে ছায়ামূর্তির মতো কিছু দেখা যাচ্ছে।

ছেরিঙ লাফিয়ে উঠল। নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল গাছের আড়ালে। তারপর দম বন্ধ করে সেই মূর্তিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

ছেরিঙের মনে হল, সোজা পথে সেই ছায়ামূর্তি যায় নি প্রাচীরের নিকটে, গেছে ঘুরে আম্রকাননের ভিতর দিয়ে। উদ্দেশ্য যে সাধু নয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ওই উঁচু প্রাচীরের কাছে তার কী প্রয়োজন!

ছেরিঙ ভাবল, আর একটু এগিয়ে যেতে পারলে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করা যেত ভাল করে। কিন্তু তার উপায় নেই। অন্ধকারের সেই মানুষটি তার উপস্থিতি জানতে পারলে এর বেশি আর কিছু জানা সম্ভব হবে না। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছেরিঙ অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ছেরিঙ একটা অস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পেল। বাঁশীর মত মিষ্টি সুর। লোকটা হয়তো শিস দিয়েছে। প্রাচীরের ও ধার থেকে কোন শব্দ এল কি না, ছেরিঙ শুনতে পেল না। কিন্তু লোকটাকে দেখল, দেওয়ালের দিকে হাত তুলে দাঁড়াল। তারপরে আর একটি ছায়ামূর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দেওয়ালের এ ধারে নয়, ও ধারে। অল্প একটু মাথা উঁচু করে একটি ভাণ্ড নামিয়ে দিল। এ-ধারের মানুষটি সেই ভাণ্ড নামিয়ে নিল।

এইখানেই শেষ নয়। লোকটি এবারে দেওয়ালের দিকে পিছন ফিরে হাঁটুর উপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। আর ও ধারের ছায়া-মূর্তি দেওয়ালের উপর উঠে এ ধারের মানুষটির পিঠ বেয়ে এ ধারে এসে নামল।

নতুন মূর্তিটি কি পুরুষ! ছেরিঙ চমকে উঠল ভূত দেখার মতন। পুরুষ তো মনে হচ্ছে না! বেশবাস বুঝি পুরুষেরই মতো, কিন্তু

আকারে আচরণে কিছু গরমিল দেখা যাচ্ছে। উত্তেজনায় ছেরিঙ এগিয়ে যাচ্ছিল। কোনমতে নিজেকে সে সামলে নিল।

ভাণ্ডটি হাতে নিয়ে ছায়ামূর্তি দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল আম্রকাননের ভিতর। ছেরিঙ অপেক্ষা করতে লাগল। নালন্দার কোন গৃহের দিকে তারা নিশ্চয়ই যাবে। কার গৃহে যাবে? এই পবিত্র বিদ্যা-পীঠের ভিতর নারীর গোপন পদসঞ্চারের আশঙ্কা করে ছেরিঙের মন বেদনায় ভরে গেল। প্রশস্ত পথ যাদের জন্য উন্মুক্ত নয়, তারা কি অভিসারে আসবে অন্ধকার পথে!

জলাশয়ের ধারে বসতে ছেরিঙের আর ইচ্ছা হল না। পিছন ফিরেই চমকে উঠল। সহকারী কর্মদান তার কাঁধে হাত রাখলেন।

আপনি এখানে?

ছেরিঙ জিজ্ঞাসা করল।

পুরন্দর বললেনঃ আমিও সেই কথাই জানতে চাইছি।

সংক্ষেপে ছেরিঙ বললঃ ইচ্ছা।

পুরন্দরও সংক্ষেপে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন, বললেনঃ সাবধান।

ভয় দেখাচ্ছেন?

ভয় আছে বইকি।

আপনি তা হলে লোক চেনেন নি।

এ কথার উত্তরে পুরন্দর হাসলেন। বড় ক্রূর নিষ্ঠুর হাসি।

ছেরিঙ এগিয়ে গেল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে।

॥ দশ ॥

ছেরিঙ এই সহকারী কর্মদানের নাম জানত না। কর্মদানের কজন সহকারী আছেন, তাও তার জানা নেই। না জানারই কথা। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এঁদের কতটুকুই বা সম্বন্ধ। কিন্তু এই ভদ্রলোক প্রথম দিনেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধু কথায় নয়, কাজেও। তিনি যে একজন কর্তা ব্যক্তি এবং তাঁকে যে সম্মান করে চলতে হবে, প্রকারান্তরে এই কথাই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এঁর সঙ্গে আচার্যদের আচরণের তফাত আকাশ আর পাতাল। আচার্যদের সঙ্গে কথা বলে মনে হবে, তাঁরা বুঝি এখনও শিক্ষার্থী আছেন। ছেরিঙকে যত কথা তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার হিসেব নেই। তার দেশের কথা। আচার আচরণ, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম বিজ্ঞান, সমাজ ও রাজনীতির কথা। সব কথার উত্তর ছেরিঙ দিতে পারে নি। করুণ ভাবে তাকিয়েছে তিব্বতী লামার দিকে। তিনি প্রবীণ লোক, তাঁর অভিজ্ঞতা বেশি। কিন্তু তিনি তাকে সাহায্য করেন নি। বলেছেন: আমি তো দেশের কথা একরকম ভুলেই গেছি। তুমি সবে এসেছ, তুমি সব বল।

মহাস্থবিরের নাম মনে হলে শ্রদ্ধায় তার মাথা নুয়ে পড়ে। তিনি শিশুর মতো, দেবতার মতো। ছেরিঙ আজও একজন এমন মানুষের সাক্ষাৎ পায় নি। সারাক্ষণ তিনি ধর্মগঞ্জে থাকেন। ধর্মগঞ্জে তিনটি প্রাসাদ, রত্নসাগর রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। এই তিন গ্রন্থাগারে বুঝি আকাশের তারার চেয়েও বেশি পুঁথি আছে। ছেরিঙ ভাবে, মহাস্থবির কি সমস্ত গ্রন্থই পড়ে ফেলেছেন!

এতদিন তার গর্বের সীমা ছিল না। এই মহাবিদ্যালয়ের ভিতর

তার স্থান হয়েছে, এই মহাপুরুষদের কাছে তার বিদ্যার্জন সম্পূর্ণ হবে, তার জীবন সার্থক হবে। শকুন্তলার জন্যও সে অত বিচলিত হয় নি। সে জানত যে শকুন্তলারা একদিন জয়ী হবেই। তার জন্য আন্দোলনের দরকার। যে আন্দোলন এদেশে শুরু হয়েছে, তাকে আরও তীব্র করতে হবে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে।

কিন্তু আজ তার মন বেদনায় পূর্ণ হয়ে গেছে। আজ সে বুঝি এই মহাবিহারের আর একটা রূপ দেখতে পেয়েছে। রূপের ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু সেই অপবিত্র ক্লেদাক্ত জীবনের অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছেরিঙকে আজ মর্মাহত করেছে। বিষণ্ণ মনে সে তার ঘরে ফিরে এল।

জ্ঞানমিত্র বোধ হয় তার প্রতীক্ষা করছিল। সাড়া পেতেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চুপি চুপি প্রশ্ন করল: কোথায় গিয়েছিলে?

কেন বল তো?

দরকার আছে।

আমারও দরকার ছিল।

সেই দরকারের কথাই তো জানতে চাইছি।

বিরক্ত ভাবে ছেরিঙ বলল: বলব না।

জ্ঞানমিত্রের রাগ করা উচিত ছিল, কিংবা অপমানিত বোধ করা। কিন্তু তার বদলে সে হাসল। এই কদিনেই কি ছেরিঙকে সে ভালবাসতে শুরু করেছে! নির্বান্ধব বিদেশী ছেলে। হয়তো বা দয়া করে! কিন্তু ছেরিঙ আজ সে সব কথা ভাবতে চাইল না। বলল: হাসলে যে!

তোমার রাগ দেখে।

কে বলল আমি রাগ করেছি?

তোমার মেজাজ।

পরের কথায় তোমার এত আগ্রহ কেন বল তো ?

ছেরিঙ জানতে চাইল।

হাসিমুখে জ্ঞানমিত্র বলল : তোমাকে যে পর ভাবি নে।

ছেরিঙ এ কথার উত্তর দিল না।

জ্ঞানমিত্র বলল : বেশ, তা হলে আমি নিজের কথাই বলি।

বলে বৌদ্ধদের লড়াইয়ের গল্প শোনাল ছেরিঙকে। তার বেরিয়ে যাবার পর লড়াই বেধেছিল দু দলে—মহাযান ও হীনযান মতের কোন্‌টা বড় এই নিয়ে। সে কী সাংঘাতিক তর্ক!

ছেরিঙ হঠাৎ উৎসাহ পেল, বলল : কী ঠিক হল ?

ঠিক আবার কী হবে : জ্ঞানমিত্র উত্তর দিল অনাসক্ত ভাবে : ঠিক কখনও হয়েছে ? দুপক্ষই চেষ্টা করতে লাগল তাদের মতটা বড় প্রতিপন্ন করবার!

কী কী প্রমাণ দিল ?

সে অনেক কথা। সমস্ত আমার মনে নেই।

ছেরিঙ আফসোস করে বলল : ছি ছি, আমি শুনতে পেলাম না!

শুনলেও বুঝতে পারতে না। আমার সঙ্গে গল্প করতে পারছ বলে কি সকলের সঙ্গেই পারবে!

কেন পারব না ?

অল্পদিনে যা শিখেছ, তার প্রশংসা করি। কিন্তু সব শিখে ফেলেছ, তা তো মানতে পারব না।

ছেরিঙ বলল : তা হলে আর কিছু বলবে না?

কেন বলব না : জ্ঞানমিত্র উত্তর দিল : বলব বলেই তো এসেছি।

তারপর হেসে বলল : মারামারিটা হল না। যতক্ষণ নিজের নিজের মতের গুণ বর্ণনা করছিল, ততক্ষণ ঠিক ছিল। বেশ জমে উঠেছিল। হঠাৎ একজন আর একজনের দোষ দেখাল। আর

যায় কোথায়? সবাই উঠে পড়ে লাগল অপরের দোষ দেখাতে। আচার্যেরা এসে উপস্থিত না হলে হাতাহাতি নিশ্চয়ই হয়ে যেত।

একটু থেমে জ্ঞানমিত্র বলল: তুমি আসবার কিছু আগে আর একদিন এমনি ঘটনা ঘটেছিল। সেবারে জৈন বিদ্যার্থীরা লড়াই করেছিল অন্য বিহারে। তাদের শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর সম্প্রদায়। সে কী লড়াই! আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সব সরে পড়েছিল। শুধু রক্তের দাগ ছিল। মহাস্থবিরের কানে খবর গেছে শুনে আমরাও পালিয়ে এলাম।

গম্ভীর ভাবে ছেরিঙ বলল: তুমি হিন্দু বলে এ সবে খুব আনন্দ পাও, তাই না?

তা একটু পাই বইকি। তবে সঙ্কীর্ণতা দেখে দুঃখও পাই। আমাদেরও তো সঙ্কীর্ণতা আছে।

হুঁ।

ছেরিঙের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আজ তোমার কী হয়েছে বল তো?

জ্ঞানমিত্র জানতে চাইল।

ছেরিঙ বলল: কী আবার হবে!

এখনও শকুন্তলার কথা ভাবছ?

শকুন্তলার কথা!

ছেরিঙ চমকে উঠল। তার কথা যে সে ভুলেই গেছে। কী আশ্চর্য! ঘর ছেড়ে যখন সে বেরিয়েছিল, তখন সে শকুন্তলার কথা ভেবেই উতলা হয়েছে। তার কথা সে কেমন করে ভুলল! তখনই মনে পড়ল সেই ছায়ামূর্তির কথা। সত্যিই কি কোন নারী এল নালন্দার মহাবিহারের মধ্যে! সঙ্গে সুরার ভাণ্ড! কিন্তু কার কাছে? পুরন্দরের? না, আর কোন উত্তমপুরুষের জন্য পুরন্দর এ সবের ব্যবস্থা করেছে! ছেরিঙের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কেন, চুপ করে রইলে যে!

জ্ঞানমিত্র কৌতুকের হাসি হাসল ছেরিঙের দিকে তাকিয়ে।

ছেরিঙ বলল: এই মহাবিহারের আর কোন খবর রাখ?

কী খবর বল তো?

লেখাপড়া আর ধর্মচর্চা ছাড়া অন্য কোন খবর?

এ ছাড়া আর কী খবর থাকবে?

ছেরিঙ এবারে অন্য প্রশ্ন করল, বলল: কর্মদানের কোন সহকারীকে চেন?

জ্ঞানমিত্র বলল: পুরন্দরকে চিনি।

কী রকম লোক বল তো?

না না, ওর সম্বন্ধে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না!

তুমি তাকে ভয় পাও?

কে পায় না!

তুমি কাপুরুষ।

ছেরিঙ তাকে ধিক্কার দিল।

জ্ঞানমিত্র বলল: তোমার তিরস্কার আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু পুরন্দরের সম্বন্ধে আমায় কিছু বলতে ব'লো না।

বলেই সে ঘরের বাহিরটা একবার দেখে এল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল: লোকটা পারে না এমন কোন কাজ নেই।

ছেরিঙও প্রশ্ন করল আস্তে আস্তে: তবে তার শাস্তি হয় না কেন?

শাস্তি! শাস্তি কে দেবে! যারা শাস্তি দেবে, তারাও তো তাকে ভয় পায়।

উত্তরে ছেরিঙ শুধু হুঁ বলল।

তারপর জ্ঞানমিত্রের প্রশ্ন: হঠাৎ তুমি ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

লোকটা ভয় দেখাচ্ছে।

ভয় দেখাচ্ছে!

বলছে, শিক্ষা দিয়ে দেবে।

কেন, তুমি তার কী করেছ?

তার জারিজুরি ধরে ফেলেছি।

অ্যাঁ!

জ্ঞানমিত্র চমকে উঠে পিছিয়ে গেল।

তুমিও ভয় পেলে নাকি?

না, আমার আর ভয় কিসের!

ভয় তো পেয়েছ দেখছি।

করুণভাবে জ্ঞানমিত্র বলল: তোমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি কিনা!

তার জন্যেই তোমার ওপরে হামলা করবে?

কিছুই বিচিত্র নয়।

ছেরিঙ হাসছিল। সেই হাসি দেখে জ্ঞানমিত্র বলল: আমরা বিদ্যার্থী, রাজনীতিতে আমাদের কী প্রয়োজন! রাজনীতি তো আমাদের স্বর্গের সিঁড়ি গড়বে না, বরং বিদ্যাচর্চার ব্যাঘাত ঘটলে পরকালটি ঝরঝরে হবে।

মানুষ রাজনীতিও তো শেখে, উত্তর-জীবনে রাজনীতিরই বেশি দরকার। গণিত আর দর্শন দিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ হবে না।

জ্ঞানমিত্র বলল: আমাদের দেশে ব্যাকরণের পর ধর্ম অর্থ কাম শাস্ত্র শিক্ষার পদ্ধতি। বারো বছর ব্যাকরণ শিক্ষার পর মনুর ধর্মশাস্ত্র, তারপর চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, এমন কি বাৎসায়নের কামশাস্ত্র শেখবারও নির্দেশ আছে। কিন্তু রাজনীতির উল্লেখ নেই।

ছেরিঙ বলল: চাণক্যের মতো রাজনীতিজ্ঞ নাকি জন্মায় নি। তাঁর অর্থশাস্ত্রে কি রাজনীতির উল্লেখ নেই?

জ্ঞানমিত্রের এ জ্ঞান ছিল না। বলল: জানিনে।

ছেরিঙ বলল : জগতের বিচার করবে নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে, বই পড়া বিদ্যা দিয়ে নয়।

মানে ?

মানে, এই মহাবিহারে পাপ ঢুকেছে। আর ঢুকেছে বলেই ভয়।

কিসের ভয় ?

শকুন্তলাকে তারা ভয় পায়, তাই তাকে ঢুকতে দিতে চায় না।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না ছেরিঙ।

জ্ঞানমিত্রের কণ্ঠে যেন আর্তনাদ শোনা গেল।

ছেরিঙ হাসল, বলল : বুঝতে তোমার দেরি হবে।

জ্ঞানমিত্র বাহিরটা আবার দেখে এল, বলল : ব্যাপারটা আমায় খুলে বলবে ?

তার আগে তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও।

জ্ঞানমিত্র তার মুখের দিকে চাইল। ছেরিঙ বলল : এই মহাবিহারের ভিতর নারী আসে ?

জ্ঞানমিত্র চমকে উঠল : তুমি কী বলছ ছেরিঙ !

সুরা আসে ?

সুরা !

হ্যাঁ।

আমি ঠিক বলতে পারব না।

এর বেলায় কোন সন্দেহ আছে ?

চিন্তিতভাবে জ্ঞানমিত্র বলল : দু-একজনকে মত্ত অবস্থায় দেখেছি। সে সুরা পানে, না অন্য কারণে, তা বলতে পারি না।

নূপুরের নিক্কণ বুঝি কোনদিন শোন নি ?

জ্ঞানমিত্র ছেরিঙের হাত চেপে ধরল। বলল : তুমি কি সন্দেহ করবার কারণ দেখেছ ?

ছেরিঙ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জ্ঞানমিত্র বলল : কেন উত্তর দিচ্ছ না ?

উত্তর তো নেই ভাই। ধরবার আগে আমি নিজেই ধরা পড়ে গেছি। দুঃসাহস আমার আছে, কিন্তু মূল্য আমাকে বেশি দিতে হবে। নিজের জীবনের চেয়ে কম দাম দিলে এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারব না।

জ্ঞানমিত্র তার হাত ছেড়ে দিল।

ছেরিঙ বলল : এর চেয়ে বড় কাজ আমার সামনে আছে। মহাবিহারের পাপমোচন নয়। পাপ তো সর্বত্রই আছে। এ তার চেয়েও বড় কাজ।

জ্ঞানমিত্র ছেরিঙকে থামতে দিল না। বলল : সে কী কাজ ভাই ?

আত্মস্থ ভাবে ছেরিঙ বলল : সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা। পুরুষের পদাশ্রিত না হয়ে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

তাতে তোমার লাভ ?

লাভ ! লাভের কথা তো আমি ভাবি নি ভাই।

একটু থেমে বলল : গৌতম বুদ্ধ যখন নির্বাণের কথা ভেবেছিলেন, তখন তো নিজের লাভের কথা চিন্তা করেন নি। করেছিলেন সাধারণ মানুষের লাভের চিন্তা।

ছেরিঙ গুণগুণ করে গাইল :

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম আবেরিনো॥

ছেরিঙ থামতেই জ্ঞানমিত্র বলল : এরই মধ্যে পালি প্রাকৃত শিখে ফেলেছ !

শিখেছি বলব না, শেখবার চেষ্টা করছি।

ছেরিঙ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : শকুন্তলা কোথায় থাকে বলতে পার ?

তুমি জান না বুঝি ?

জানলে তোমায় কেন জিজ্ঞাসা করব!

তা ঠিক। কিন্তু বললে বুঝতে পারবে তো?

তা পারব।

জ্ঞানমিত্র বলল: মহাবিহারের বাইরে থাকে, কিন্তু বেশি দূরে নয়। তাই রোজ আসতে পারে জ্বালাতন করতে।

এ কথা তো আমিও জানি। এ আর নতুন কথা কী!

জ্ঞানমিত্র হাসল রসিয়ে রসিয়ে। বলল: নতুন কথা আমি কোথা থেকে জানব বল! এই তোমার বুদ্ধির অহংকার!

ছেরিঙ বলল: আমি খুঁজে নেব।

বল কি, তুমি বাইরে যাবে!

কেন, কী ক্ষতি আছে গেলে?

কিন্তু কী করে যাবে?

বাধা কিসের! যে পথে পাপ ঢোকে মহাবিহারে, আমিও সেই পথেই যাব!

জ্ঞানমিত্র কথাটা ঠিক বুঝল না। শুধু এইটুকু বুঝল যে এই তিব্বতী যুবকটি আজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। উত্তেজিত হবার মতো কোন কারণ নিশ্চয়ই ঘটেছে। সে কথা আজ সে বলবে না। তাই অনুরোধ করল: বেশ, ফিরে এসেই তোমার গল্পটা শুনিও।

দরজা দিয়ে বেরবার সময় জ্ঞানমিত্র চমকে উঠল। তার মনে হল, কে যেন সেখান থেকে সরে গেল। একটা ছায়া। অন্ধকারে তার বেশি কিছু দেখা গেল না।

ছেরিঙের ইচ্ছা ছিল, রাত্রেই সে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে সে নিরস্ত হল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাহিরের পথ ঘাট মাটি আর আকাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখন আর আত্মগোপন করার উপায় নেই। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে। ছেরিঙ ঠিক করল, অন্ধকার রাতে সে বাহিরে যাবে। কিংবা দিনের

বেলায়।

ছেরিঙের বড় অস্থির বোধ হচ্ছে আজ। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে হচ্ছে, এই মহাবিহারের ভিতর আরও কয়েকজন বোধ হয় তারই মতো জেগে আছে। তবে তারা অকারণে নিশ্চয়ই জেগে নেই। জীবনকে তারা উপভোগ করছে।

কিন্তু তার জন্য তো গোটা পৃথিবীটাই আছে। এই বন্দী-শালার বাহিরে গেলে আর তো কোন বিধি-নিষেধ মানতে হবে না, প্রয়োজন থাকবে না অন্ধকারে লুকোচুরি খেলবার। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা, উপভোগের অজস্র সামগ্রী, আকণ্ঠ পান করে মাতাল হবার প্রবল প্রলোভন।

তবু কেন মহাবিহারের ভিতরে তারা রাত জাগে ?

ছেরিঙের মনে হল, দিনের মানুষ আর রাতের মানুষে অনেক প্রভেদ আছে। দিনের বেলায় মানুষ একটা মুখোশ পরে থাকে। রাতে সেই মুখোশটা যায় খুলে। মুখোশহীন মানুষ বড় বীভৎস জীব। রাতে মানুষ লুকিয়ে থাকে বলেই তার স্বরূপটা সহজে ধরা পড়ে না।

হঠাৎ তার শকুন্তলার কথা মনে পড়ল। শকুন্তলা এখন কী করছে ? সকলের মতো ঘুমচ্ছে, না তারই মতো রাত জাগছে অস্থির ভাবে! শকুন্তলাকে একবার ক্ষেপিয়ে দিতে হবে। প্রথম দিন নালন্দায় প্রবেশের সময় তার যে রূপ দেখেছে সেই রূপ! প্রতিবাদ জানাবার অমন তীক্ষ্ণ ভঙ্গি সে আগে কখনও দেখে নি। তর্জনীতে তার সমস্ত দৃঢ়তা যেন সংহত হয়েছে। শকুন্তলার সে রূপের তুলনা নেই। আর একবার দেখতে পেলেই সে তার মূর্তিটা সম্পূর্ণ করবে।

মূর্তিটা কি ঠিক হয় নি ? বোধ হয় হয়েছে। তবু একবার দেখা দরকার। রাগ করলে শকুন্তলাকে বেশি ভাল দেখায়। তাই মন থেকে সে রূপ আর মুছে যায় না। কিন্তু মূর্তি গড়বে বলে

তো তাকে দেখে নি। পুকুরের ধারে একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিল। অমন পাথর দেখলে নিজের দেশেও সে কুড়িয়ে আনত। তারপর মনে হল মূর্তি গড়বার কথা। চুপিচুপি মূর্তি গড়ছে। শব্দ বেশি হলে বিদ্যার্থীদের ব্যাঘাত ঘটবে।

ছেরিঙের ইচ্ছা হল, প্রদীপ জ্বেলে সেই মূর্তিটা একবার দেখে। ছেরিঙ আর শুয়ে থাকতে পারল না। অন্ধকারে হাতড়ে প্রদীপটা জ্বালল। কিন্তু মূর্তিটা খুঁজে পেল না। ঘরের একটা কোণায় জামা-কাপড়ের নিচে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল। সেখানে সেটা নেই। ঘরের আর তিনটে কোণাও দেখল, কোথাও নেই।

বাহির থেকে কেউ হেসে উঠল না! পুরন্দরের হাসি শুনলে ছেরিঙ নিশ্চিন্ত হত। এ নিশ্চয়ই পুরন্দরের কাজ। সে না হলে আর কে তাকে পদে পদে চোখে রাখছে। কিন্তু কেন রাখছে! প্রয়োজনটা কিসের! সে তো একজন সাধারণ বিদ্যার্থী ছাড়া আর কিছু নয়! নালন্দার মহাবিহারে তার মত বিদ্যার্থী আছে দশ হাজার। এরা কি সকলকেই এই রকম লক্ষ্য করে! না, তার বেলাতেই এই কড়াকড়ি! যদি শেষেরটাই সত্য হয়, তা হলে নানা রকম সন্দেহের অবকাশ আছে। একটু সতর্ক হওয়াও দরকার।

বেদনায় ছেরিঙের মন ভরে গিয়েছিল। অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে সে ওই মূর্তিটি গড়েছিল। ভেবেছিল, শকুন্তলাকে ভিতরে আনতে পারলে তাকে এটি উপহার দেবে। তার সফলতার স্বীকৃতি। সেই আনন্দলাভের আশা থেকে সে বঞ্চিত হল।

তারপরেই অন্য কথা ভাবল। তার মন আছে। তার হাত আছে। কে তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে! আবার সে পাথর আনবে, আবার গড়বে মূর্তি। প্রয়োজন হলে সে নেবে জ্ঞানমিত্রের সাহায্য। কিংবা তিব্বতী লামার, কিংবা সেই চীনের লামার, যাঁর সঙ্গে সে এই নালন্দায় এসেছে। শকুন্তলাকে সে ভিতরে আনবে, আর উপহার দেবে তার নিজের

হাতে গড়া একটি মূর্তি। ছোট ছোট অক্ষরে নিজের নামটুকু লিখে দেবে মূর্তির পায়ের উপর।

ছেরিঙ তার শোক ভুলে গেল।

॥ এগারো ॥

সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। অন্ধকার আকাশ, চাঁদ আজ শেষ রাত্রে উঠবে, কিংবা উঠবে না। সূর্যকে আড়াল করতে পারে, আকাশের মেঘ আজ এমনি ঘন হয়ে আছে। ঘরের ভিতর আর একটা মূর্তি তৈরি করতে করতে ছেরিঙের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। তার দেশেও এক একদিন আকাশে এইরকম মেঘ জমত, শিলাবর্ষণ হত। তারপর খানিকক্ষণ বৃষ্টি পড়ত। ভারতবর্ষের আকাশে আজ প্রথম মেঘ দেখছে। বৃষ্টিপড়া দেখে নি, দেখে নি শিলাবৃষ্টি। মূর্তিটা লুকিয়ে রেখে ছেরিঙ ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এল।

পুরনো অভ্যস্ত পথে এল জলাশয়ের ধারে। স্বচ্ছ নীল জল আজ বাতাসে দুলছে। দুলছে সবুজ ডাঁটার উপর নীল পদ্ম, আর গোল গোল সবুজ পাতা। অন্ধকারে ধূসর দেখাচ্ছে সবকিছু। ছেরিঙ সব জানে বলেই রঙের প্রভেদটা বুঝতে পারছে। তা না হলে সব কিছু কালো বলত।

পিছনের আমবাগানে আজ অন্ধকার বেশি জমেছে। দূরের প্রাচীরটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। ছেরিঙ আজ জলাশয়ের ধারে বসল না। নিঃশব্দে সে প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেল।

তাই তো, এ সে কী করছে! সে কি কোন অনুসন্ধানে যাচ্ছে, না তার প্রাচীর ডিঙিয়ে বাহিরে যাবার প্রয়োজন! ছেরিঙ একবার পিছনের দিকে তাকাল। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখতে পেল না। কিন্তু সামনের প্রাচীরের গায়ে একটা চিহ্ন দেখতে পেল। সেদিন সে ঠিক এইখানটায় একটা লোককে দেখতে পেয়েছিল। তার পরের ঘটনাও আজ তার মনে পড়ছে। এখানে

আর কেউ নেই যে তাকে পিঠ পেতে উপরে তুলে দেবে। বাহিরে যেতে হলে সে ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।

ছেরিঙ একটা গাছ খুঁজতে লাগল। তার ডাল বেয়ে এই প্রাচীরের উপর উঠবে। ওধারে নামবার কোন অসুবিধা হবে না। নামবার ব্যবস্থা না থাকলেও লাফিয়ে নামা যাবে।

বেশিক্ষণ ছেরিঙকে খুঁজতে হল না। সুবিধে মতো একটা ডাল পেয়ে প্রাচীরের উপর উঠে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে দেখল, এক জায়গায় নামবার ব্যবস্থা আছে। খানিকটা উঁচু জমি, কতকটা ধাপের মতো। স্বচ্ছন্দে ছেরিঙ নেমে এল।

বাহির থেকে ছেরিঙ একবার নালন্দাকে দেখল। নালন্দার মহাবিহার। তারপরেই হেসে উঠল প্রবল উল্লমে। ছেরিঙ আর পরাধীন নয়, ছেরিঙকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। ছেরিঙ আজ নালন্দা বিহারের বাহিরের মহাস্থবির।

হঠাৎ তার বড় দুঃখ হল। শকুন্তলার সম্বন্ধে মহাস্থবিরের মনোভাব তার জানা হয় নি। তিনি সব কথা জানেন কিনা তাও সে জানে না। তিনি তো দেবতার মতো দূরদর্শী! কাল যা হবে, আজ কি তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন না? দেখতে পেলে তাঁর তো আপত্তি হবার কথা নয়। অনিবার্যকে তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করতে পারেন। মনে মনে ছেরিঙ স্থির করল, এইবার নালন্দার ভিতর ফিরে গিয়ে একবার মহাস্থবিরের কাছে নিশ্চয়ই যাবে। আর অকপটে তার সমস্ত কথা সেই মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করবে।

শকুন্তলাকে খুঁজে বার করতে ছেরিঙের কিছু মাত্র কষ্ট হল না। সম্পন্ন এক গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছে। আর ইতিমধ্যেই সকলে চিনে ফেলেছে। ছেরিঙ আরও লক্ষ্য করল যে লোকে তাকে সমর্থনের চেয়ে নিন্দাই করছে বেশি। তাদের ধারণা, মেয়েটা অনধিকার চর্চা করছে। আর এর জন্য তার শাস্তি পাওয়া

উচিত।

ছেরিঙকে দেখে শকুন্তলা হেসে উঠল, বলল : তাড়িয়ে দিল তো?

গম্ভীর ভাবে ছেরিঙ বলল : হ্যাঁ।

সত্যি!

শকুন্তলার বিস্ময়ের যেন সীমা নেই।

উত্তরে এবার ছেরিঙ হাসল, বলল : সাহসের এই দৌড়!

শকুন্তলা বলল : নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেয় নি, তুমিই এসেছ পালিয়ে। কিন্তু ফেরার পরের কথা ভেবেছ কি!

সব কথা ভেবে করতে গেলে কি সব কাজ করা যায়!

কিন্তু তোমাকে যদি আর ওরা ঢুকতে না দেয়?

গম্ভীর ভাবে ছেরিঙ বলল : তোমাকে নিয়ে দেশে ফিরব।

আমাকে নিয়ে?

তোমাকে আমার খুব দরকার।

কথা না বলে শকুন্তলা তার মুখের দিকে তাকাল।

ছেরিঙ বলল : আমাদের দেশের মেয়েরা পড়তে চায় না, নিজেদের দাবি জানাতে জানে না, শেখে নি সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তুমি গেলে তাদের চোখ ফুটবে।

শকুন্তলা হেসে বলল : আমার কী হবে?

তোমার!

হ্যাঁ, আমার!

ছেরিঙের সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, বলল : তাই তো!

আমার কথা বুঝি কিছু ভাব নি?

তোমার কথাই তো সারাক্ষণ ভাবছি। না ভাবলে এমন অসময়ে এখানে কেন এলাম!

ভেবেছ তোমার নিজের স্বার্থ, আমার স্বার্থ তো নয়।

ছেরিঙ নিঃশব্দে এ কথা মেনে নিল।

শকুন্তলা বলল : আরও একটা কথা ভাব নি। তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে লোকে কী ভাববে!

এ কথার উত্তর দিতে ছেরিঙ একটুও দেরি করল না, বলল : কী আবার ভাববে! আমি তো কোন অন্যায় করছি না।

তোমাদের দেশে ন্যায় অন্যায়ের ধারণা তো বেশ! এমনি অন্ধকার রাতে লুকিয়ে কোন মেয়ের কাছে এলেও লোকে বুঝি অন্যায় বলে না?

ছেরিঙ প্রতিবাদ করে বলল : আমি তো কোন অন্যায় করতে আসি নি।

শকুন্তলা হাসল, বলল : তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।

নিশ্চয়ই হবে: ছেরিঙ আপত্তি জানাল: কালই আমি মহাস্থবিরের সঙ্গে দেখা করব। তোমার কথা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব।

তারপর?

তারপর দেখব, তিনি কী রায় দেন।

দেখা করতে পারবে তো? দেবে তোমায় তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে?

না দিলেই চলবে কি না!

শকুন্তলা মুচকি হেসে বলল : তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ।

কেন?

কেন আবার! যেমন ছেলেমানুষের মতো কথা, তেমনি কাজ। তোমাদের মহাস্থবির কি একটা মেয়ের জন্য তাঁদের সমস্ত আইন-কানুন পালটে দেবেন!

তবে তুমি রোজ ঝগড়া করতে যাচ্ছ কেন?

যাচ্ছি ঝগড়া করবার জন্যই।

তাতে লাভ?

লাভ তুমি।

আমি!

ছেরিঙ চমকে উঠল।

চমকালে কেন! আজ তুমি, কাল একজন, পরশু আর একজন। একদিন হয়তো নালন্দার সমস্ত বিদ্যার্থীই আমার দলে আসবে। দু-একজন আচার্যেরও কি মন গলবে না!

তোমার তো অনেক আশা।

এই আশা নিয়েই তো লোকে আন্দোলন করে। পিছনে সত্য থাকলে পাকা ভিতেও ফাটল ধরে, অট্টালিকাও ধ্বসে পড়ে।

ছেরিঙ আশ্চর্য হল, বলল: একজনের আন্দোলনে?

যুগে যুগে যে সব আন্দোলন সার্থক হয়েছে, সে সবই তো একজনের। তোমাদের বুদ্ধকে দেখ, আমাদের কৃষ্ণ। আন্দোলনকারী দুর্বল হলেই তার দলের প্রয়োজন। দলে আমার বিশ্বাস নেই।

অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে ছেরিঙ শকুন্তলার কথা শুনছিল।

শকুন্তলা বলল: আমিও দল গড়তে পারি। কিন্তু তাতে আমার বল বাড়বে না।

কথাটা ছেরিঙের বিশ্বাস হল না, বলল: আমরা তো একত্র হলেই জিতি।

বাধা দিয়ে শকুন্তলা বলল: দল গড়লে দল ভাঙারও তো ভয় আছে। দলটাকে সামলাতেও অনেক পরিশ্রমের দরকার। কিন্তু একা থাকলে কোন ভাবনা নেই। সারাক্ষণ আক্রমণ চালাও। যদি নিষ্ঠা থাকে, আর যদি মেরে না ফেলে, তা হলে জয় সুনিশ্চিত। মেরে ফেললেও জয়। দেহের এক এক ফোঁটা রক্ত থেকে লক্ষ রক্তবীজের জন্ম হবে।

ছেরিঙ যেন নতুন কথা শুনছে। বলল: তবে আমি কেন হেরে গেলাম? যা চেয়েছিলাম, তা তো করতে পারলাম না!

শকুন্তলা সাহস দিয়ে বলল : পারবে। হাল ছেড়ে দিলেই বুঝব, পারলে না।

ছেরিঙ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল : তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

কোথায় ?

আমাদের দেশে ? বেশি দূর নয়, বেশি কষ্টও নয়। গেলে তোমার ভালই লাগবে।

উত্তরে শকুন্তলা শুধু হাসল।

হাসি নয় শকুন্তলা, আমি তোমার উত্তর চাই।

দেব।

দেব নয়, এখুনি দাও।

হাসিমুখেই শকুন্তলা বলল : আগে আমায় মহাবিহারের ভিতরে নাও, তারপর তোমার দেশে যাব।

দুঃখিত ভাবে ছেরিঙ বলল : আমার ক্ষমতা থাকলে কি তোমায় আমি টেনে নিতাম না ?

ক্ষমতা তুমি কেড়ে নাও।

সে তো একদিনের কাজ নয় শকুন্তলা, সারা জীবনেও সম্ভব কিনা জানি নে। আমার মতো বিদ্যার্থী সেখানে দশ হাজার।

দৃঢ়স্বরে শকুন্তলা বলল : বিদ্যার্থী দশ হাজার আছে জানি। কিন্তু তোমার মতো কজন আছে, তার খবর পাই নি।

ছেরিঙের চোখজোড়া বিস্ফারিত হল।

শকুন্তলা বলল : কিন্তু একজনই যথেষ্ট। দুধার থেকে ধাক্কা পড়লে ফাটল তাড়াতাড়ি ধরবে। আমার চেয়ে তোমাকে ওরা ভয় পাচ্ছে বেশি।

আমাকে ভয় পাচ্ছে ?

পাচ্ছে বইকি। নালন্দার সিংহদ্বার বন্ধ করে তারা আমাকে আটকাতে পারে। কিন্তু তোমাকে তো শাসন করতে পারে না।

তুমি যে দশ হাজারের একজন। দলকে তারা ভয় পায়। দল গড়ার সুযোগ তোমায় দেবে না।

এসব কথা তুমি কোথায় জানলে ?

তুমি অনুমান কর।

পারব না।

চেষ্টা কর।

তোমার অনুমান।

কতকটা ঠিক। বাকিটা বলেছে পুরন্দর।

পুরন্দর! ঃ ছেরিঙ চমকে উঠল ঃ সে লোকটা কি তোমার কাছেও আসে ?

তুমি ওকে ভয় পাও নাকি ?

ভয়!

ছেরিঙ নাক সেঁটকাল।

তবে ?

ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তুমি তাকে জানলে কী করে ?

শকুন্তলা হেসে বলল ঃ সে নিজেই নিজেকে জানাতে চায়। সে যে একজন কৃতী মানুষ, প্রাণপণে তার প্রমাণ দিচ্ছে।

ছেরিঙের গা জ্বালা করছিল। এই উষ্মাটুকু লক্ষ্য করে শকুন্তলা বলল ঃ অনেক কিছুর লোভ দেখাচ্ছে। সে সব কথা শুনলে তুমি পাগল হবে।

তুমি শোন কেন ?

না শুনে কী করব বল! তোমার সব কথাও তো আমাকে শুনতে হয়। এই যে তুমি বললে, আমাকে নিয়ে তুমি তোমাদের দেশে যাবে। এ কথাও তো শুনতে হল। পুরন্দর শুনলে তোমায় মেরে ফেলবে।

পুরন্দর কী করে শুনবে ?

দুষ্টু মেয়ের মতো শকুন্তলা বলল : যদি আমি বলে দিই ?

দিও বলে। ওই কাপুরুষটাকে আমি ডরাই নাকি! আমি ওর নাড়ির খবর রাখি। সবাইকে বলে দেব।

শকুন্তলা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল : কিছুই জান না।

জানিনা কিছু!

শকুন্তলার হাসি দেখে ছেরিঙের লজ্জা হল। মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে ছেলেমানুষ ভাবছে। তাকে চটিয়ে দিয়ে সব কথা জেনে নিতে চায়। বলল: ভাবছ, আমায় চটিয়ে দিলে ছেলেমানুষের মতো সব কথা বলে ফেলব। সে আশা নেই। আমি তোমার কথা শুনতে এসেছি।

জিভ কেটে শকুন্তলা বলল : ছি ছি, তোমায় আমি ছেলেমানুষ ভাবতে পারি! এমন বড়সড় চেহারা, এমন দুর্যোগের রাতেও পালিয়ে বাইরে এসেছ, তোমাকে ছেলেমানুষ কে বলবে!

ঠাট্টা করছ তো!

এই তো, দিব্বি সব বুঝতে শিখেছ : শকুন্তলা উত্তর দিল : সেদিন যখন কথা হচ্ছিল, তখন তো অর্ধেক কথাই বুঝতে পারছিলে না। আজ দেখছি ঠাট্টাও ধরে ফেলছ! তোমার বাহাদুরী আছে।

ছেরিঙ এ কথায় ভুলল না, বলল : তুমি পুরন্দরের কথা বল।

শকুন্তলা বলল : ওর কথা তুমি জিজ্ঞেস ক'রো না। ওকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

ছেরিঙ বলল : তবু বল।

আকাশের কালো মেঘ গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। এ তো শুধু রাতের অন্ধকার নয়। দুর্যোগের ইঙ্গিত। তারাহীন আকাশে আজ দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আছে। মেঘের ডাক আজ সেই কথাই মনে করিয়ে দিল। শকুন্তলা বলল : শুনলে তো।

ছেরিঙ বলল : ও-তো মেঘের ডাক।

আর কিছু নয় ?

হয়তো ঝড় উঠবে।

দুর্যোগ বল। পুরন্দর তোমার জীবনে আনবে দুর্যোগ।

নিজের অজ্ঞাতসারে ছেরিঙ চমকে উঠল।

শকুন্তলা বলল : আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের কথা সে জানতে পারবেই। সে আরও অনেক কিছু জানে, যা তুমি আমি জানি না। আমাদের মনের কথাও বুঝি জানে। তুমি খুব সতর্ক থেকো।

আকাশের মেঘ আরও জোরে ডেকে উঠল। তার আগে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। খুব তীব্র আলো। ছেরিঙ সেই আলোতে শকুন্তলার মুখ দেখতে পেল স্পষ্টভাবে। এ একেবারে অন্য মুখ। কোমল করুণ, দুরন্ত বেদনায় মলিন মুখ। যে মূর্তিটা সে প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে, তার সঙ্গে এ মুখের বুঝি কোন মিল নেই। ভয়ে ভয়ে ছেরিঙ ডাকল : শকুন্তলা!

বল।

একটা কথা শুনবে ?

শুনব।

সেদিনের কথা তোমার মনে আছে, যেদিন আমরা প্রথম এসেছিলাম নালন্দার সিংহদ্বারে! তুমি দ্বারপালদের সামনে দাঁড়িয়েছিলে তোমার তর্জনী তুলে, প্রতিবাদ জানাবার মতো তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে! তেমনি করে তুমি আর একবার দাঁড়াবে ?

কেন বল তো ?

আমার দরকার আছে।

আজ আমাকে অন্য মেয়ে মনে হচ্ছে, তাই না ?

উচ্ছ্বসিত ভাবে ছেরিঙ বলল : তোমার সেই রূপটি আমার ভাল লেগেছে।

কিন্তু এখন যে বড় অন্ধকার!

তা হোক। অন্ধকারেই আমি তোমায় দেখতে পাব। চোখ বুজেও আমি তোমায় দেখতে পাই।

শকুন্তলা হাসল, কিন্তু সে হাসিতে আজ আর শব্দ হল না। বলল : চল।

বাতাসে শব্দ বাড়ছে। গাছে গাছে সেই বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে। গাছপালা দুলে উঠছে। ছেরিঙ বলল : কোথায় ?

শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল : চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

তোমার সেই রূপ ?

ছেরিঙ অনুনয় জানাল।

বিদ্যুতের আলোয় ভাল দেখতে পাবে।

শকুন্তলা এগিয়ে গেল।

॥ বারো ॥

সেদিন বৃষ্টি নামবার আগে ছেরিঙ ঘরে পৌঁছতে পারে নি। শকুন্তলার সঙ্গেই জলে ভিজেছে। পথের ধারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দুজনে ভিজেছে। প্রথম দিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তখন-তারা পরস্পরকে দেখে প্রচুর হেসেছে। ভাল লেগেছে হাসতে।

এক সময় শকুন্তলা বলেছেঃ তুমি বিদেশী ছেলে, তোমার অসুখ না করে।

তাড়াতাড়ি ছেরিঙ বলেছিলঃ জলে ভেজা আমাদের অভ্যাস আছে, আমার ভয় তোমাকে নিয়ে।

শকুন্তলা হেসে বলেছিলঃ এ তো আমাদের দেশের বর্ষা। আমার জন্যে ভেব না।

প্রাচীরের ধারের সেই জায়গাটা ছেরিঙ খুঁজে বার করল। তারপর সেই গাছের শাখা। প্রাচীরের উপর উঠে গাছ বেয়ে নিচে নামল।

নিজের ঘরে যখন ফিরল, তখন রাত কত হয়েছে বলা শক্ত। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই একটাও। শুধু মেঘ আর বর্ষা। বিদ্যুৎ ফুরিয়ে গেছে। বাতাসেরও জোর নেই। মড়মড় করে গাছের শাখা প্রশাখা ভাঙতে ছুটে আসছে না, আসছে সোঁ সোঁ করে, বর্ষার ধারাকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে দিতে।

ঘরে এসে ছেরিঙ যখন ভিজে কাপড় বদল করছিল, পা টিপে টিপে জ্ঞানমিত্র এল তার কাছে। এত রাত্রে ছেরিঙ তাকে আশা করে নি, তাই বোধ হয় চমকে উঠেছিল। তারপরেই সামলে নিল নিজেকে, বললঃ ঘুমোও নি এখনও?

জ্ঞানমিত্র সে কথার উত্তর দিল না, বলল: কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

ছেরিঙ সংক্ষেপে উত্তর দিল : বাইরে।

বাইরে কোথায় ?

তাতে তোমার কী দরকার ?

কিছু না। কিন্তু তোমারই বা বাইরে কী দরকার ছিল ?

কিছু না।

জ্ঞানমিত্র তার খুব কাছে এগিয়ে এল, বলল : আজ প্রাণে বেঁচে গেছ।

কী রকম ?

কাল বাঁচবে কিনা জানি না।

তার মানে ?

জ্ঞানমিত্র বলল : তোমার তলব পড়েছিল। বিচারের তলব। তুমি নাকি মহাবিহারের আইন ভঙ্গ করেছ।

আমি ?

হ্যাঁ, তুমি।

কে বলল এই কথা ?

জ্ঞানমিত্র বলল : পুরন্দর জানিয়ে গেছে।

আমার বিচারটাও কি সেই করবে ?

সেই তো সব।

বিচারের রায়টাও বোধ হয় জানিয়ে গেছে।

বোধ হয় তাড়িয়ে দেবে।

বোধ হয় না।

না কেন ?

কাল সকালে যে তার রায় বদলাবে।

বল কি ?

গম্ভীর ভাবে ছেরিঙ বলল : আমাকে বার করে দেওয়াও আর

নিরাপদ ভাববে না।

আশ্চর্য হয়ে জ্ঞানমিত্র বলল : তোমার কথাগুলো বড় হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে।

তোমার কথাগুলোও তাই।

যতটুকু জানি, তা আমি বলেছি।

আমি যা জানি, তা বলবার উপায় নেই।

তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

ছেরিঙ অনুতাপের সুরে বলল : ছি ছি, এ কথা ব'লো না নালন্দার দেওয়ালের যে কান আছে।

তা সত্যি।

জ্ঞানমিত্রের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এই মানুষটাকে ছেরিঙের ভাল লাগে। নালন্দায় তার নিঃসঙ্গ জীবনটা সারাক্ষণ পূর্ণ করে রাখতে চেষ্টা করে। সে না থাকলে এখানে তার অবসরের সময় হত দুর্বিসহ। তাই তাকে বেদনা দিয়ে ছেরিঙের নিজেরই খারাপ লাগল। বলল : তোমার কাছে কিছুই লুকোতে চাই না।

কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল : শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।

জ্ঞানমিত্রের দু চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল।

ছেরিঙ বলল : তাকে বিদ্যার্থী করে নেবার জন্য মহাবিদ্যালয়ের ভিতরে আমি আন্দোলন করব।

আর কোন গর্হিত কাজ তুমি কর নি?

জ্ঞানমিত্র জানতে চাইল।

ছেরিঙ বলল : গর্হিত কাজ আমি কিছুই করি নি।

পুরন্দরের কথায় মনে হয়, তুমি অনধিকার চর্চা করেছ।

তা করেছি। মহাবিহারকে তারা অপবিত্র করেছে। আমি একদিন তা দেখতে পেয়েছি।

কী রকম?

এর বোশ আজ তুমি জানতে চেও না।

জ্ঞানমিত্র মেনে নিল, বলল : তাই থাক্।

বলে নিজের ঘরে সে ফিরে গেল।

ছেরিঙের ঘুম এল না। তার মনে হল, রাত্রিশেষে সে বুঝি আর নতুন আলো দেখতে পাবে না। কেন এমন হল, সে তা ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু ভাবতে ভাবতেই তার বিশ্বাস হল গভীর।

ঘরের চারিদিকে ছেরিঙ তাকিয়ে দেখল। বেশ অন্ধকার। প্রদীপের আলোয় একটি কোণা শুধু আলো হয়ে আছে। অন্যদিন এমন হত না। এই প্রদীপটাই সারা ঘরখানা আলো করত। আজ তার আলো কমে গেছে. শিখাটি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। এক সময় হয়তো নিবেই যাবে। এমনি করেই হয়তো তার জীবনটাও নিবে যাবে।

কিন্তু আজই কেন নিববে?

কোন কারণ নেই। তবু ছেরিঙের মনে হচ্ছে, জীবনের সব কাজ আজ শেষ করে রাখা উচিত। সব কাজ কি শেষ করা যায়! কেউ কি পেরেছে শেষ করতে! তবু যতটুকু পারা যায়, ততটুকুই লাভ। ছেরিঙ আলোর সামনে গিয়ে বসল। সেখানে তার লেখবার পুঁথি আছে, লেখনী আছে। যা কিছু লেখবার তা লিখে রাখবে। তাড়াতাড়ি লিখবে। তারপর শকুন্তলার সেই মূর্তিটা। তারও কাজ কিছু বাকি আছে। ঠোঁটে আর একটু দৃঢ়তা ফুটবে, দৃষ্টি আর একটু তীক্ষ্ণ হবে। নিজের নামটিও তার পায়ের কাছে লিখে দেওয়া দরকার। যদি আর তার সময় না পাওয়া যায়!

কিন্তু কী লাভ হবে নিজের নাম লিখে? লাভ? তা একটু হবে বইকি। যদি নিজের হাতে উপহার দেবার সময় না পায়, শকুন্তলা হয়তো এই উপহারের কথা জানতে পাবে। জানবে একটা গেঁয়ো লোক এসেছিল বিদেশ থেকে। দিতে কিছুই পারল না। শুধু একটু শ্রদ্ধা রেখে গেল তার পাথরের পায়ে। পাথর

অনেক দিন বাঁচে। মানুষের চেয়ে তার আয়ু অনেক বেশি।

তারপর ?

তারপর আর কিছু সে লিখে যায় নি।

শীতের ছোট বেলা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। এবারে থমথমে অন্ধকার নামবে। গাছের পাতা দুলছে শিরশির করে। শীতের বাতাস। কানের কাছে এসে বুঝি ঘরে ফেরার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আমি জানতে চাইলাম : শকুন্তলার কী হল ?

দাওয়া হাসল, বলল : জানি নে।

আমার মন আছে ভারাক্রান্ত হয়ে। বললাম : আর কিছু জানতে পারা কি সম্ভব নয় ?

কেন সম্ভব নয় : দাওয়া আমাকে উৎসাহ দিল : কত অসম্ভবকে মানুষ সম্ভব করছে, আর আমরা পারব না দুটো মানুষের স্মৃতি উদ্ধার করতে !

ঠিক কথা। মানুষ সিন্ধুর সভ্যতাকে উদ্ধার করেছে। চেষ্টা করছে আকাশের চাঁদে যাবার। ছেরিঙ আর শকুন্তলার কাহিনী তার কাছে কত তুচ্ছ ব্যাপার বললাম : নিশ্চয়ই পারব।

নালন্দার ধ্বংসস্তূপ দেখতে যাঁরা এসেছিলেন, একে একে সবাই তাঁরা ফিরে গেছেন। ভিতরটা হয়তো এতক্ষণে খালি হয়ে গেছে। বাহিরেও কেউ নেই। দু-একজন মানুষ চায়ের দোকানটায় এখনও কলরব করছে। আরও কিছুক্ষণ করবে। তারপর তারাও চলে যাবে। দোকানদারও হয়তো দোকানের ঝাঁপ তুলে বাড়ি ফিরবে। আমাদেরও ফেরা দরকার।

দাওয়া বলল : কী ভাবছ ?

আমি কি ফেরার কথা ভাবছি ! বোধ হয় তাই। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না।

দাওয়া বলল : আমার ধর্মশালায় চল।

আজ কি তার সময় আছে ?

দাওয়া বলল : তুমি দূরে থাকলে কাজের বড় অসুবিধে যে!

উপায় কি বল : আমি উত্তর দিলাম : তুমি নালন্দায়। আমি রাজগীরে।

দাওয়া বলল : সেই জন্যেই তো বলছিলাম—

বাকিটুকু সে আর বলতে পারল না। দুটো মন একমুহূর্তে হয়তো কাছাকাছি আসতে পারে। দেহের অনেক বাধা। মনের আছে অবাধ স্বাধীনতা, কিন্তু সংযম শাসন সবই তো দেহের জন্য। তাকে সমাজ মানতে হয়, সংস্কারও মানতে হয়। দেখা হতে না হতেই একটা অনাত্মীয় পুরুষকে কাছে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যায় না। ভাবের আবেগ আছে, কিন্তু আবেগে অন্ধ হলে বিপর্যয় ঘটে। দাওয়ার বুঝি সেই কথাই হঠাৎ মনে পড়ল। তাতেই গেল থেমে।

বললাম : কয়েকটা দিন যাতায়াত করেই দেখা যাক না। অসুবিধে যদি বেশি হয়, তোমার কথা আমি ভেবে দেখব।

দাওয়া বলল : স্টেশনের কাছেই আমাদের ধর্মশালা। সেখানে আমি কয়েকটা জিনিস তোমাকে দেখাব।

আমি তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি তুলে ধরলাম।

দাওয়া বলল : সেই মূর্তিটা, আর একখানা পুথি। রক্তমাখা জামাটাও আছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দাওয়াও উঠে দাঁড়াল। এবারে আমাদের ফিরতে হবে।

॥ তেরো ॥

নালন্দার ষ্টেশনকে ঠিক ষ্টেশন বলে মনে হবে না। মনে হবে, একটা লেভেল ক্রসিঙের উপর গেট লজ। বড় পাকা রাস্তা রেল লাইনের ধারে ধারে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। এক জায়গা থেকে আর একটা বড় রাস্তা গেছে নালন্দার দিকে। তারই উপর রেলের ষ্টেশন। ছোট একটি ঘর। পাশে বড়বাবু ও ছোটবাবুদের থাকবার বাড়ি। ট্রেন এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। মানুষ জন গাড়ি থেকে নামে রাস্তার উপরেই। মোড়ের উপর একা গাড়ি আর সাইকেল-রিক্সা। নামলেই লুফে নেবে। পৌঁছে দেবে নালন্দার ধ্বংসস্তূপে।

এইখানে এসে যখন পৌঁছলাম, ষ্টেশনের দরজা তখন বন্ধ। কোন গাড়ি নেই। মোড়ের উপরের চায়ের দোকানে জানা গেল, বাস পাওয়া যাবে। রাজগীর তো বেশি দূর নয়। দরকার হলে একা গাড়িও যেতে পারে। দাওয়া আমার সঙ্গে ছিল। ধর্মশালার সামনে দিয়েই এসেছি। কিন্তু সে সেখানে নেমে যায় নি। এখানে মাত্র কয়েক গজ রাস্তা। যেতে হয়তো দু-তিন মিনিটও সময় লাগবে না। বলল: এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, আমার কাছে বসবে চল।

বললাম: তার কি সময় হবে?

দাওয়া বলল: কতটুকু আর সময় লাগবে?

আজ ছুটি দাও: আমি অনুরোধ জানালাম: কাল সকাল বেলাতেই তোমার কাছে আসব।

ঠিক বলছ তো? তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব কিন্তু।

আমি তা হলে খুশীই হব।

দাওয়া আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, আমি তার এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরেছি। বিদেশে তার জীবনে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে। অনেক ভাগ্যে একটা ভাল সঙ্গী মেলে। মনের মত সঙ্গী তো সংসারে কমই মেলে। কারও সারা জীবনে হয়তো একটাও মেলে না। দাওয়ার অভিজ্ঞতা অন্য রকম নয়। তাই আমাকে পেয়ে কিছু পেয়েছে ভাবছে।

বললাম : কত দিন এখানে আছ ?

অনেকদিন।

অনেকদিন মানে ?

হিসেব না করেই দাওয়া বলল : মাস খানেকের বেশিই হবে।

একেবারে একা ?

প্রায় তাই।

প্রায় মানে আমি বুঝি। ধর্মশালায় লোক আসে আর যায়। থাকতে কেউ আসে না। কাজেই সে প্রায় একাই আছে।

অনেক দূরে একজোড়া চোখের মতো দুটো বাতি দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার উপর আলো ফেলে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দাওয়া বলল : এইবারে তোমার গাড়ি আসছে।

রাস্তার উল্টো দিক দেখিয়ে বললাম : কাল এই দিক থেকে আসব।

বাসখানা খুব তাড়াতাড়ি আসছিল। সেদিকে লক্ষ্য করে দাওয়া বলল : কাল কি তুমি দেরিতে আসবে ?

হেসে বললাম : ঘুম ভাঙলেই চলে আসব। সকালেই বোধ হয় একটা ট্রেন আছে। ট্রেনে আসতে আমার বেশি সুবিধে।

আমার হাসি দেখে দাওয়া বোধ হয় একটু লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল : কী সুবিধে ?

বললাম : স্টেশনের বাইরেই আমার হোটেল। একেবারেই হাঁটতে হয় না।

বাস এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমি উঠে পড়লাম। দাওয়া হাত নেড়ে বলল: কাল দুপুরে আমরা এক সঙ্গে খাব।

জনকয়েক লোক নামল, কেউ উঠল না। আমি কোন রকমে মুখ বাড়িয়ে বললাম: আচ্ছা।

তারপরেই বাস ছাড়ল।

রাজগীরের হোটেলে ফিরে একটা দুঃসংবাদ পেলাম। তপতী চিঠি লিখেছে, তার চাকরি গেছে। আর্ট স্কুলে এই মেয়েটার সঙ্গে এক সঙ্গে ছবি এঁকেছি। তার আঁকার হাত কারও চেয়ে খারাপ ছিল না। পরীক্ষাতেও ভাল করেছে। কিন্তু তার পরে মেয়েটা ধাক্কা খাচ্ছে। ছবি এঁকে বাড়ির দেওয়াল সাজালে সবাই বাহবা দেয়। কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনতে চায় না। দু-এক জায়গায় চাকরির চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পায় নি। চাকরি দেবার মালিকেরা কী ভাবেন, তাঁরাই জানেন। তপতী শুধু চেষ্টা করে করে হতাশ হয়েছে। এইবারে আমি তার ব্যবস্থা করে এসেছিলাম। স্কুল থেকে আমি নিয়েছি লম্বা ছুটি। আমার শরীর খারাপ, হাওয়া বদলের দরকার। আমার জায়গাতেই তপতীকে ঢুকিয়ে এসেছিলাম। সেই তপতীর চাকরি গেল!

তপতী লিখেছে, কর্তারা মনে করেন, তার কোন মেয়ে-স্কুলে শিক্ষকতা করা উচিত। এ স্কুলে কেন উচিত নয়, তার কারণ দর্শান নি। সহানুভূতি দেখবার মতো তার অনেক বন্ধু আছে, কিন্তু তাকে সাহায্য করবার আর কেউ নেই।

তপতী আর একটা কথা লিখতে পারত। তার রূপের কথা। সে তার রূপকে দায়ী করে ভাগ্যের জন্য। ভাবে সুশ্রী হলে তার দুঃখ থাকত না। আমি তার সঙ্গে ঠিক একমত নই। সে সুশ্রী হলে এতদিন নিশ্চয়ই তাকে কুমারী থাকতে হত না। ছবির একজিবিসন করলে অনেক ছবি হয়তো চড়া দামে বিক্রি হত।

চাকরিও হয়তো হত, কিন্তু সে অন্য চাকরি। তার যোগ্যতার উপযুক্ত কোন কাজ সে পেত কিনা সন্দেহ। দাওয়া তো সুন্দরী মেয়ে। তাকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করব।

দাওয়ার উত্তর শুনে আমি আশ্চর্য হই নি। সকালের মিঠে রোদে সে স্টেশনের কাছেই পায়চারি করছিল। আমি মুখ বাড়িয়ে দূর থেকেই তাকে চিনেছিলাম। গাড়ি থামতেই হাত নেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি ঝোলাটি তুলে নিয়ে নেমে পড়লাম।

দাওয়া বলল: আজকেও ওটা এনেছ?

বললাম: রাজগীরের জল আছে, হজমী ওষুধ।

দাওয়া হাসল।

তপতীর কথা আমার মনে ছিল। বললাম: একটু অনধিকার চর্চা করব?

দাওয়া হেসে বলল: তার আগেই তোমায় অধিকার দিয়ে দিলাম।

দিলেও হয়তো ভাল লাগবে না: আমি উত্তর দিলাম: তোমার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করব। কী কর, বা কী করবে, মানে রোজগারের কী ব্যবস্থা, এই সব। ভাল না লাগলেই ভাবব, সত্যি কথা বলছ।

দাওয়া অত্যন্ত সহজভাবে বলল: খারাপ না লাগলেও ভেব, মিথ্যা বলছি না।

তথাস্তু।

দাওয়া বলল: বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রী নিয়ে ভেবেছিলাম, কোন কলেজে পড়াবার অধিকার পাব। ছেলেবেলা থেকেই লেখা-পড়া শেখবার শখ ছিল বেশি কিনা। তাই আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বিদেশে এসে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম।

উৎসুক ভাবে আমি বললাম: তারপর?

দাওয়া আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে হেসে ফেলল। বলল: এখন অন্যরকম দেখছি।

কী রকম?

দেখছি, স্বাধীনভাবে কোন কাজ করবার উপায় নেই। দুদিকের বাধা। আত্মীয় বন্ধুরা বিয়ে করে সংসারী হতে বলছে। আর কলেজের কর্তৃপক্ষের নানা বায়নাক্কা। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়তে দিলেই নাকি ছেলেদের মাথা বেগড়াচ্ছে, তার ওপর মেয়ে মাস্টার।

দাওয়া হেসে উঠল। কিন্তু আমি দেখলাম, সে হাসিতে আনন্দের রেশ নেই, আছে বেদনার ইঙ্গিত। 'কাঁদি নি তো' বলে নতুন বউ যেমন শ্বশুরবাড়ির লোক ভোলাতে চেষ্টা করে, কতকটা তেমনি। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

ততক্ষণে আমরা ধর্মশালার ফটকের সামনে পৌঁছে গেছি। নতুন তোরণ, একেবারে তিব্বতী কায়দায়। দু ধারের থামের উপর যেন একখানি নৌকো বসানো। তার উপর বিচিত্র বর্ণের কারুকার্য। এখনও কাজ হচ্ছে।

দাওয়া বলল: এস।

এই ডাকটি আমার ভাল লাগল। ঠিক এমন করে কেউ আমাকে ডাকে না। কিন্তু মন বুঝি এরই অপেক্ষা করে আছে। বললাম: চল।

দাওয়া আমাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে এল। বলল: বস, আগে তোমাকে একটু ভাল চা খাওয়াই। আমাদের দেশের চা।

ইংরেজী বইয়ে তিব্বতী চায়ের গল্প আমি পড়েছি। নুন মাখন মেশানো সিদ্ধ চা। অদ্ভুত তার আস্বাদ। বিদেশীরা খেয়েই বমি করে ফেলে। তাড়াতাড়ি বললাম: রক্ষা কর। চা আমার পেটে সইবে না।

দাওয়া হেসে বলল: হজমি জল তো আছেই। চায়ের পরে

একটু জল খেয়ে নিও।

শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে আরও অনেক খাবার এল। খেতে খেতে দাওয়া বলল ঃ এই খাজা কোথাকার জান ?

জানি নে।

এই ছোট লাইনের ওপর সিলাও নামে একটা ছোট স্টেশন আছে। সেখানকার খাজা বিখ্যাত।

সেই স্টেশনটা আমি দেখেছি।

দাওয়া বলল ঃ কিন্তু এর চেয়ে বড় কথাটা লোকে ভুলে গেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, সিলাও নামটা এসেছে শীলাদিত্য থেকে। রাজা হর্ষবর্ধনের নাম ছিল শীলাদিত্য। কারও মতে শীলভদ্রের নামে সিলাও নাম। শীলভদ্র তো তোমাদের দেশের গৌরব !

বললাম ঃ বিশেষ করে বাংলাদেশের । শীলভদ্র বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন। নালন্দা বাংলার কাছে ঋণী থাকবে চিরকাল।

দাওয়া বলল ঃ আমরাও। আমাদের ধর্ম তো তোমরাই একদিন পৌঁছে দিয়েছিলে ! পণ্ডিত শান্ত রক্ষিতকে পাঠিয়েছিলে। সারাজীবন তিনি আমাদের দেশেই কাটালেন। আজ যে লামাধর্ম তিব্বতের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করছে, সেটা প্রচার করেছিলেন তোমাদের দেশের পণ্ডিত পদ্মসম্ভব। তারপর অতীশ দীপঙ্কর।

এসব ইতিহাসের কথা। আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এসব আসে না। এলে আমার জীবন হয়তো অন্য রকম হত। মানে, ছবি আঁকা না শিখে লেখাপড়া শিখতাম। ছাত্র না চরিয়ে দেশ চরাতাম। মনে মনে এই রকম একটা লোভ হয়েছিল আর্ট স্কুল থেকে বেরবার পরে। পেটের চিন্তায় তখন শিল্প-সাধনা মাথায় উঠেছে। ছাত্র বলে অভিভাবকদের যেটুকু দুর্বলতা ছিল, তা ফুরতে বেশি সময় লাগে না। সেই সময়েই দেশ চরাবার শখ হয়েছিল।

ইচ্ছা করলেই তো সরকার-বাহাদুর গুণীজনের আদর করতে পারেন।

দাওয়া বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, আমি অন্যমনস্ক হয়ে আছি। বলল : কী ভাবছ ?

বললাম : ইতিহাসের কথা।

মানে ?

মানে, ভাবছিলাম এতগুলো নাম তুমি কত সহজে বলে গেলে। একটু পরিশ্রমও করতে হল না। কী করে জানলে এসব ?

দাওয়া হাসল, বলল : এ তো ছেরিঙ টাশির গল্প নয় যে দিনের পর দিন অন্ধকারে হাতড়াতে হবে। ছেলেদের পড়ার বইয়েও ওদের সমস্ত খবর পাবে।

আশ্চর্য! ছেরিঙ টাশির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। দাওয়ার কথাতে আমার সব মনে পড়ে গেল। ওই অজ্ঞাত মানুষটাকেই আবিষ্কারের চেষ্টায় আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আর একটা মেয়ে, তার নাম শকুন্তলা। নালন্দার বাহিরে সে থাকত। ছেরিঙ তাকে সাহায্য করবে, এই আশা নিয়ে সে কতদিন বেঁচেছিল কে জানে। তারও জীবনটা কি অজ্ঞাত থেকে যাবে ?

দাওয়া বলল : আবার কিছু ভাবতে শুরু করেছ! তোমাকে নিয়ে আর পারি নে।

বললাম : তুমিই যে ভাবিয়ে তুলেছ।

আমি!

আবার কে ? আমি ছেরিঙকে জানতাম, না শকুন্তলাকে।

আমাকে জানতে বুঝি ?

দাওয়া হাসল দুষ্টু মেয়ের মতো।

বললাম : সেই কথাই তো ভাবছি। তোমাকে তো অজানা মনে হচ্ছে না।

গম্ভীর ভাবে দাওয়া জিজ্ঞাসা করল : কোথায় দেখেছ বল তো ?

কোথায় দেখেছি: চোখ বন্ধ করে আমি ভাববার ভান করলাম: মনে হচ্ছে, বোধ হয় নালন্দাতেই দেখেছি।

নালন্দায়?

হ্যাঁ, নালন্দায়। সেই দ্বারপণ্ডিতদের সঙ্গে তুমি কী ঝগড়াই করছিলে। দেখে আমি থ হয়ে গিয়েছিলাম।

তুমি কোথা থেকে দেখলে?

কেন তিব্বত থেকে আমরা আসছিলাম। তোমার কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম সকলে। তুমি বললে, এই খাঁদা নাকের লোকগুলো সরসর করে ঢুকে যাচ্ছে, এদের তো তোমরা আটকাচ্ছ না? দ্বারপণ্ডিতরা বললেন, ওরা যে বিদেশ থেকে কষ্ট করে আসছে। রাগ করে তুমি বললে, আর আমি বুঝি কোন কষ্ট করি নি?

ভ্রূ কুঁচকে দাওয়া বলল: ও, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তারপর পালিয়ে পালিয়ে তুমি বাইরে আসতে। একদিন এসেছিলে ঝড়ের রাতে। তারপর—

তারপর?

তারপর আর তোমায় দেখতে পাই নি।

দাওয়ার চোখের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। এক রকমের অদ্ভুত আচ্ছন্নতা তার দৃষ্টিতে। সামনেই হারিয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম: কী ভাবছ?

দাওয়া চমকে উঠল। বলল: কিছু না তো!

না কেন! তুমি সারাক্ষণ ভাব। তোমাকে নিয়ে আর পারি নে।

দাওয়া তখন সহজ হয়ে গেছে। খিলখিল করে হেসে উঠল। আমিও যোগ দিলাম তার হাসিতে।

খাওয়া আমাদের শেষ হয়েছিল। এক ফাঁকে দাওয়া উঠে গিয়ে দু পেয়ালা চা নিয়ে ফিরল। তার হাত থেকে একটা পেয়ালা

নিয়ে বললাম : চা আমাকে খাওয়াবেই দেখছি।

ভয় পাচ্ছ নাকি ?

তা একটু পাচ্ছি বইকি।

পেটের ভয়, না বমির !

বমির ভয় হয়, এ কথা তোমায় কে বললে ?

দাওয়া হেসে উত্তর দিল : তোমাদের দেশের বই।

আমি আশ্চর্য হয়েছি দেখে খুশী হয়ে বলল : সাহেবদের লেখা বই ইস্কুলে পড় নি ?

দাওয়া ঠিক ধরেছে, আমার বিদ্যে ইস্কুলের ওই বই পর্যন্ত। বললাম : একটু একটু মনে পড়ছে যেন।

আশ্বাস দিয়ে দাওয়া বলল : ভয় নেই, বমি হলেও আমি তোমায় মেরে ফেলব না।

মেরে ফেললেও আপত্তি করব না।

বল কি ?

বললুম : সে মরণ যে স্বরগ সমান।

বলেই চায়ের বাটিতে মুখ দিলাম। অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে লাগল, কিন্তু খারাপ লাগল না। কয়েক চুমুক খেয়ে মনে হল, ভালই লাগছে। নতুন ধরনের আস্বাদ। মন্দ কি।

আমার যে খারাপ লাগে নি, দাওয়া বুঝতে পেরেছে। বলল : দুদিন খেলেই এই চায়ের উপকার দেখবে। তখন আর চায়ের নামে ভয় পাবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম : সেদিন কি আর ফিরে পাব !

আমার আপসোস শুনে দাওয়া হাসল। তারপর খালি বাটিটা দেখে বলল : আর একটু দেব ?

ভয়ে ভয়ে বললাম : আজ থাক্।

তারও চা শেষ হয়েছিল। বলল : চল এইবারে কাজে চলি।

আমাদের কাজ আছে। গল্প করে সময় কাটালে আমাদের

চলবে না। ছেরিঙ ও শকুন্তলার গল্প আমাদের সম্পূর্ণ করতে হবে। তা কি পারব। তবু আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম: চল।

॥ চোদ্দ ॥

আবার আমরা নালন্দার টিকিট কাটলাম। আবার গিয়ে ভিতরে বসলাম। সেই বড় গাছটার ঘন ছায়ায়। দাওয়া বলল : এবারে কী করবে বল ?

তুমি বল : আমি উত্তর দিলাম : আমি তো তোমায় সাহায্য করব।

বেশ কথা।

তাই তো কথা ছিল।

দাওয়া বলল : এ কি হাতের কাজ, যে তুমি আমায় এগিয়ে দেবে! আমি যদি বুঝতেই পারতাম তো তোমার সাহায্য চাইব কেন ?

সে কথা তো ঠিক। কিন্তু আমার অবস্থাটাও একবার ভাব। এক-আধ বছর নয়, হাজার বছরেরও বেশি কেটে গেছে। সে যুগের একটা লোকও যদি বেঁচে থাকত তো তাকে গিয়ে ধরতে পারতাম। দাওয়ার হঠাৎ মনে পড়ল যে তার একটা মস্ত ত্রুটি হয়ে গেছে। বলল : কাণ্ড দেখলে!

বললাম : না।

না মানে! ছেরিঙের জিনিষগুলো তোমায় দেখাব বলে ধর্মশালায় নিয়ে গেলাম, আর সেই কথাই গেলাম ভুলে!

ছি ছি, আমিও তো ভুলে গেছি। বললাম : আমারই তো দেখতে চাওয়া উচিত ছিল।

তুমি চাইবে কেন!

বলে দাওয়া উঠে পড়ছিল।

বললাম : উঠছ কেন ?

তোমাকে দেখাব না ?

বসে বসেই আমি বললাম : সে না হয় ফেরার পথে দেখব। এখন কী কর্তব্য, তাই ঠিক করি।

দাওয়া আবার স্থির হয়ে বসল।

খানিকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম : ছেরিঙের যে গল্প বললে, তার সবই কি লেখা আছে ?

প্রায় সবটাই। খানিকটা কল্পনা।

কল্পনা তোমার, না আর কারও ?

আমার ছোট ঠাকুর্দার।

শকুন্তলার সম্বন্ধে তিনি কিছু কল্পনা করেন নি ?

করেছিলেন।

করেছিলেন ?

কিন্তু তুমি সে কথা বিশ্বাস করবে না।

আপত্তি জানিয়ে বললাম : কেন করব না! ছেরিঙের সব বিশ্বাস করলাম, আর শকুন্তলার কথা বিশ্বাস করব না!

দাওয়া চুপ করে রইল।

বললাম : বল।

দাওয়া আমার মুখের দিকে তাকাল গভীর দৃষ্টিতে। তারপর বলল : তিনি বলেছিলেন, শকুন্তলা আমাদের দেশে এসেছিল।

তোমাদের দেশে!

চমকে উঠলে, তাই নয়! চমকাবার মতোই কথা যে!

না না, তা নয়। আমি তার পরের কথা জানতে চাইছি।

আস্তে আস্তে দাওয়া বলল : খুঁজে খুঁজে শকুন্তলা নাকি নাম গিয়েল গোম্পায় গিয়েছিল। মরবার কিছু আগে। আমাদের গ্রামেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আমি কোন কথা কইতে পারলাম না।

দাওয়া বলল : ছেরিঙ টাশির অসমাপ্ত পুঁথিখানির একটা

পাতায় নাকি এই কথা লেখা আছে। নাম গিয়েল গোম্পার কোন লামা লিখে রেখেছেন।

জগতে কিছুই বিচিত্র নয়। জিজ্ঞাসা করলাম: আর কিছু কি তিনি লিখে রাখেন নি?

আর কিছু?

দাওয়ার দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছিল উদার দিগন্তে।

জোর দিয়ে আমি বললাম: নিশ্চয়ই আরও কিছু লিখে রেখে গেছেন।

দাওয়া ভারি আশ্চর্য হল, বলল: কী করে জানলে?

হেসে বললাম: তোমার ভাবনা দেখে।

দাওয়া তার ভুল বুঝতে পারল, বলল: কিছু না জেনেই তুমি কথা বলছ।

বললাম: তুমি তো জান, তুমি বল।

দাওয়া আপত্তি জানাল, বলল: আজ বলব না। আজ তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। ভাববে, আমি সব মনগড়া কথা বলছি।

বললাম: ছেরিঙের বেলায় তা ভাবলাম না, শকুন্তলার কথায় কেন ভাবব?

ভাববার যে সঙ্গত কারণ আছে: দাওয়া উত্তর দিল: ছেরিঙ এসেছে নালন্দায়। দূর-দূরান্তর থেকে লোক নালন্দায় আসে। কিন্তু তিব্বতে কে যায় বল। কেন যাবে। তার ওপর একাকী কোন মেয়ে।

কোন আকর্ষণ কি নেই?

কিসের আকর্ষণ বল?

প্রাণের।

প্রাণ কোথায়? কোন্ প্রাণ তাকে টানবে?

বললাম: পুরনো পুঁথির পাতায় তো সেই প্রাণের সন্ধান

মিলবে না দাওয়া, প্রাণ বড় বেরসিক জিনিস। চোখ দিয়ে দেখা যায়-না, কান পেতেও শোনা যায় না। প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় প্রাণ পেতে। এই ভাঙা ঘরবাড়ির ভেতর সেই অসাধ্য সাধন করতে কি পারবে ?

পারব না ?

দাওয়ার প্রশ্নটা বড় করুণ শোনাল।

কেন পারবে না! মানুষের অসাধ্য কি!

এ তুমি সান্ত্বনা দিচ্ছ। এই মরা জায়গাটার কোন্‌খানে আমরা প্রাণের সন্ধান পাব! আমরা তো মাটির নিচে মানুষের কঙ্কাল খুঁজছি না, আমরা যে রক্ত-মাংসের মানুষ খুঁজছি।

মানুষদের কি আর পাব! তাদের ইতিহাস পাব।

দাওয়া এ কথার উত্তর দিল না।

খানিকক্ষণ পরে বললাম: আমি হদিস দিতে পারি।

দাওয়া তখুনি মুখ তুলে তাকাল।

বললাম: তুমি জ্ঞানমিত্রের কথা বলেছিলে। বলেছিলে, সে থাকত ছেরিঙের পাশের ঘরে। এবারে তার ঘরটাও পরীক্ষা করা দরকার।

কেন বল তো ?

দাওয়া বেশ খানিকটা বিচলিত হল।

বললাম: দেওয়ালে আঁচড় কাটার অভ্যাস তার ছিল কিনা জানা নেই। থাকলে আমাদের সুবিধে হবে।

দাওয়া বলল: ঠিক বলেছ। তার ঘরটা খুঁজে পাব।

কী করে পাবে ?

দাওয়া বলল: ছেরিঙ সে কথা লিখে গেছে। তার বাঁ হাতে ঘর একই সারিতে।

জিজ্ঞাসা করলাম: ঢোকবার সময়, না বেরোবার সময়।

দাওয়া আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারল না। আমি বুঝিয়ে

বললাম : বাঁ হাতে কোন্ সময় ?

এবারে বুঝতে পেরে বলল : দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি।

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দাওয়া এগোতে এগোতে বলল : যতদূর মনে পড়ে, বেরবার সময় বাঁ হাতে। কিন্তু তাতেও ক্ষতি নেই। দুটো ঘরই আমরা ভাল করে পরীক্ষা করব। কিছু না পেলে অন্য উপায় ঠাওরাব।

নালন্দার ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে আজ আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটলাম। গাছের ছায়া থেকে নিচে নেমে, উঁচু বিহারটার পাশের সেই গলি দিয়ে, অঙ্গন পেরিয়ে, একেবারে আর একধারে এলাম। যাত্রীদের ভীড় এখানে নেই। মাটির উপরে নেই দ্রষ্টব্য কোন জিনিস। নিচে কয়েক সারি ছাদহীন ঘর। একদিন এইখানেই দাওয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

একদিন! সেই দিনটার কথা ভাববার চেষ্টা করলাম। আমি কি কাল এখানে প্রথম আসি নি! তবে দাওয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় কোথায় হল! এ তো একদিনের পরিচয় নয়! একদিনের পরিচয় কি এমন নিবিড় হতে পারে!

দাওয়া বলল : কী ভাবছ বল তো ?

অসঙ্কোচে আমি স্বীকার করলাম : আমাদের পরিচয়ের কথা ভাবছি।

ভেবে খুব আশ্চর্য লাগছে, না ?

লাগবার কথাই যে! কোথায় তিব্বতের নাম গিয়েল গোম্পা, আর কোথায় ভারতবর্ষের নালন্দা বিহার! এ দুটোর দূরত্ব আজ একেবারে ঘুচে গেছে।

মুচকি হেসে দাওয়া বলল : সাবধানে নেমো। পা হড়কালে হাড় না ভাঙুক, পথের কাঁকরে হাত-পা ছড়ে যাবে।

বললাম : সাবধানেই নামছি।

দাওয়া বলল : মাঝে মাঝে যেমন ভাবের আবেশ দেখছি, মনে

হচ্ছে না যে নিজের পায়ের দিকে মন আছে।

হেসে বললাম: মনটা যখন অন্যের পায়ের দিকে যায়, তখনই বিপদ। নিজের পায়ের দিকে কিছুতেই টেনে রাখা যায় না।

দাওয়া হাসল না। গম্ভীর ভাবে বলল: তামাশা করছ?

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম না, সে আমার সঙ্গে তামাশা করছে, না সত্যিই রাগ করেছে। তাই আমিও গম্ভীর ভাবে বললাম: সত্যি কথা বলব?

তুমি কি মিথ্যে কথাও বল?

বিপদে পড়লে বলি বইকি!

তবে আমার কাছে ব'লো না। আমার কাছে তো বিপদের ভয় নেই।

বিপদের ভয় তো তোমার কাছেই সবচেয়ে বেশি।

দাওয়া আশ্চর্য হল, বলল: সে কী কথা?

হেসে বললুম: সে কথা বললে আরও রাগ করবে। হয়তো অভদ্র ভাববে। বেহায়া ভাববে। শেষ পর্যন্ত দেশের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হবে। বলতে হবে, এদেশের মানুষগুলোই এমনি বেহায়া।

দাওয়া খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল: ভারি চালাক। কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না।

তখন আমরা ঘুরে ঘুরে ঘর দেখছি। ছেরিঙ টাশির ঘর আমার চেনা। খুঁজে বার করতে হয়তো দেরি হত, কিন্তু দাওয়ার একটুও দেরি হল না। সোজা সে আমাকে সেই ঘরে নিয়ে এল। বলল: এইবার জ্ঞানমিত্রের ঘর বার কর।

আমি পাশের ঘরে গিয়েই বললাম: এইটেই তার ঘর।

দাওয়া উত্তর দিল না। শুধু মনোযোগ দিয়ে দেওয়াল দেখতে লাগল।

বললাম: একটা কথা তুমি ভেবেছ কি? ছেরিঙের পরে আরও তো অনেকে এই সব ঘরে থাকতে পারে।

পারে বই কি।

তবে কেন আমরা দাগ দেখলেই তাদের কথা ভাবব?

ভাবা উচিত নয়। তবে ছেরিঙের সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ আছে কি?

সন্দেহ আমার ছিল না। যার হাতের তৈরি পুতুল, তারই হাতের রেখা দেখেছি দেওয়ালে। শিল্পী যে একই; তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বললাম: না।

খুশী হয়ে দাওয়া বলল: প্রমাণ পেলে আমরা সেই রকমই পাব।

কিন্তু তা আমরা পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেও কোন আঁচড়ের দাগও দেখতে পেলাম না। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর দেখেও নিরাশ হলাম। নানা রকমের চিহ্ন আছে, ক্ষতের চিহ্ন, বয়সের চিহ্ন। কিন্তু কারও হাতের সযত্নে আঁকা কোন চিহ্ন নেই। দাওয়া দুঃখিত হল। বলল: হেরে গেলাম।

আমি সে কথা মানতে পারলাম না। বললাম: এত চট করে হারতে আমি রাজী নই।

তবে কী করবে?

বললাম: ছেরিঙের ঘরটাই ভাল করে খুঁজব। সেখানে অন্য লোকের হাতও তো থাকতে পারে!

ঠিক বলেছ তো: দাওয়া খুশী হল: টুকে আমি সবই নিয়েছি; কিন্তু সে অন্য চোখে। সমস্ত রেখা একই হাতের, এই কথাই আমি ধরে নিয়েছিলাম।

আবার আমরা ছেরিঙের ঘরে ফিরে এলাম।

এই ঘরের দাগগুলো বড় স্পষ্ট। রেখাগুলো মুছে গিয়েও যায় নি। মনে হল, সযত্নে এই ঘরটিকে বুঝি রক্ষা করা হয়েছে। দাওয়ারও ঠিক এই কথাই মনে হল, বলল: এই ঘরটা কিন্তু অন্য রকম লাগছে, তাই না?

বললাম : তা লাগবেই তো।

কেন ?

কেন আবার! এই ঘরে যদি মানুষ খুন হয়ে থাকে, তাহলে কি আর কোন বিদ্যার্থী এ ঘরে থাকবে।

ঠিক বলেছ। আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। ছেরিঙের পরে এ ঘরে বোধ হয় আর কেউ থাকে নি। থাকলে এ সমস্ত দাগ মুছে যেত। এত বড় বিরাট জায়গার ভেতর এই ঘর আমি খুঁজে পেতাম না।

এ কথা বলতে বলতেই দাওয়া চিৎকার করে উঠল, বলল : দেখ তো এই লেখাগুলো!

আমি চমকে তার কাছে চলে এলাম। দাওয়া বলল : এই যে লেখাগুলো।

লেখাগুলোর উপর আমি ঝুঁকে পড়লাম। গোটা গোটা অক্ষরে চারটি পংক্তি লেখা। এ যে অন্য হাতের, তা স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল। পঞ্চম পংক্তিতে শুধু চারটি অক্ষর। মনে হল, তা বুঝি লেখকের নাম।

দাওয়া বলল : এ কি সংস্কৃত অক্ষর ?

বললাম : বোধ হয় না।

তবে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম : ভাষাতত্ত্বে আমার জ্ঞান নেই।

শেষ চারটি অক্ষর দেখিয়ে দাওয়া জিজ্ঞাসা করল : এই শব্দটি কি জ্ঞানমিত্র ?

বললাম : হতে পারে।

অধৈর্য ভাবে দাওয়া বলল : কিছু ঠিক করে বল।

হেসে বললাম : তোমার কাগজ পেনসিল দাও। টুকে নিই। পরে কোন পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়ে নেব।

দাওয়া তার ঝোলা থেকে কাগজ পেনসিল বার করল। ব্যস্ত

ভাবে এগিয়ে দিল আমার হাতে। বলল : ভাল করে লিখে নাও।

তার কথা শুনে আমি হাসলাম।

দাওয়া পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল : পুঁথির একখানা পাতার মতো মনে হচ্ছে।

আমি আমার কাজ করতে করতেই বললাম : হ্যাঁ।

দাওয়া বলল : তোমার শেষ হলে আমি একখানা ছবি তুলে নেব।

বললাম : বেশ তো।

আমার মনে হচ্ছে : দাওয়া আস্তে আস্তে বলল : এই লেখা পড়তে পারলেই রহস্যের উদ্ধার হবে। ছেরিঙের মৃত্যুর পরেই জ্ঞানমিত্র এই শ্লোক লিখেছে। এরই ভেতর গল্পের সমাধান আছে।

মাথা নেড়ে এ কথাও আমি মেনে নিলাম।

দাওয়া খুশী হয়েছে। ভাবছে তার এত দিনের পরিশ্রম আজ সার্থক হয়েছে। শুধু তার শ্রম নয়, তার জীবনও বুঝি সার্থক। গুণ গুণ করে গান ধরল :

তা মা জিতার ছ্যাঙ ক্যঙ্,
কোন ছোগ দাম-পেঅ জীগ ইয়োঙ্।

॥ পনেরো ॥

নালন্দার ধ্বংসের ভিতর আর আমরা বেশিক্ষণ কাটালাম না। সিংহদ্বারের বাহিরে একখানা বেঞ্চির উপর এসে বসলাম। রাস্তার দুধার নানা জাতের মরসুমী ফুলে ভরে আছে। নানা রঙের ফ্লক্স, হলদে গাঁদার মতো ক্যালেণ্ডুলা, লার্কস্পার ও অ্যান্টিরিনামের ডাঁটা, নাস্টারসিয়ামও ফুটেছে লতিয়ে লতিয়ে। দেওয়ালের ধারে সারি সারি চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়াও অজস্র। শীতের দুপুরে এ দেশে ফুলেরা কষ্ট পায় না। রোদ পোয়াতে আমাদেরও ভাল লাগে।

দাওয়া বলল : ওই শ্লোকটা কী করে পড়বে ?

পড়বার অসুবিধে কী ? পুরনো লেখা যাঁরা পড়তে জানেন তাঁদের কাউকে ধরব।

দুঃখিত ভাবে দাওয়া বলল : সে তো সোজা কথা নয়! তোমার জানা কেউ আছেন ?

নাম্ জানা আছে, কিন্তু পরিচয় নেই। তাতে অসুবিধে কী! সোজা গিয়ে নিজের আরজি পেশ করব। কল্‌কে পাই ভাল, না পাই আর একজনের কাছে যাব।

এদেশে বুঝি অনেক পণ্ডিত ?

পণ্ডিত লোকেই তো এদেশ ভর্তি। শুধু আমিই কিছু শিখতে পারলাম না।

দাওয়া হাসল আমার আপসোস শুনে।

বললাম : এবারে শকুন্তলার গল্প বল।

দাওয়া বলল : গল্পটা সত্য কিনা জানি নে, কিন্তু বড় করুণ সে গল্প!

দাওয়ার দু চোখের দৃষ্টি বেদনার্ত হল।

আমি কথা না বলে তাকে বলবার অবকাশ দিলাম।

দাওয়া বলল ঃ একদিন নাম গিয়েল গোম্পায় বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। গোক্সু উৎসবের চেয়েও বেশি জাঁকজমক। ভারতবর্ষ থেকে ছেরিঙ টাশি ফিরছে। লোকের মুখে মুখে এসেছে খবর। শুধু ছেরিঙ নয়, চীনের লামারা সবাই ফিরছেন। মঠে মঠে তাঁরা সংবর্ধনা পাচ্ছেন। তাদের নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ। আর নাম গিয়েল গোম্পা তো ছেরিঙ টাশির। বড় লামা এবারে তারই হাতে মঠের ভার দেবেন। তার মতো যোগ্য লামা তো আর নেই। বয়সে না হয় ছোটই হল।

চীনের লামারা সত্যিই একদিন এলেন। কিন্তু ছেরিঙ এল না। দু হাত বাড়িয়ে বড় লামা এসেছিলেন ছেরিঙকে গ্রহণ করতে। দু পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর বসে পড়লেন ধুলোর উপরেই। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে মঠের ভিতরে নিয়ে এল। শুইয়ে দিল শয্যার উপর। সেই শোয়াই তাঁর শেষ শোয়া হল।

ছেরিঙের কথা তিনি কারও কাছে জানতে চান নি। সে ছেলেটা ফিরে আসে নি, এটাই সবচেয়ে বড় সত্য। যারা বিদেশে যায়, তারা সব সময় ফেরে না। চলমান জনতার ভিতর তারা হারিয়ে যায়। ছেরিঙ হারিয়ে গেছে। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ছেরিঙের জিনিষপত্র এনেছিলেন চীনের লামারা। ছেরিঙকে ফিরিয়ে আনবার আশ্বাস যিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই সব বয়ে এনেছিলেন। বড় লামার পায়ের কাছে বসে ছিলেন তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু একটা কথাও বলেন নি। বলবেনই বা কী! তাঁরও তো কিছু জানা নেই। তিনি শুধু কানাঘুষোই শুনেছেন, সঠিক খবর কেউই জানেন না। পাঁচজনের সঙ্গে তিনিও একদিন শুনলেন যে ছেরিঙ টাশিকে নালন্দায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার জামা-কাপড় আছে, পুঁথিপত্র আছে, আর আছে একটি পাথরের

মূর্তি। নিজের ঘরে বসে ছেরিঙ তৈরি করেছিল। দেশে ফিরবার সময় তিনি ছেরিঙের এই সম্পত্তি কর্মদানের কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন।

এ কার মূর্তি? সবাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি শকুন্তলার গল্প করেছিলেন সবার কাছে। ভারতবর্ষের মেয়েরা নাকি আগুনের মতো। আগুনের জ্বলন্ত শিখা। ছেরিঙ সেই আগুনেই পুড়ে গেল। সাবধান না হলে গোটা নালন্দাটাই নাকি একদিন পুড়বে। চীনে অমন মেয়ে নেই। বোধহয় তিব্বতেও নেই। এ দেশে অমন মেয়ে এলে এ দেশটাও পুড়বে।

ছেরিঙের সেই অসমাপ্ত পুঁথিটার ভিতর এই সব কথা কে লিখে রেখেছেন। শকুন্তলার কথা মনে হয় একটু বাড়িয়েই লিখেছেন। বলেছেন, এই মেয়েটাই নাকি ছেরিঙের মৃত্যুর কারণ। সে জাদু জানে, ইত্যাদি।

কাজেই অনেকদিন পরে খুঁজতে খুঁজতে যখন শকুন্তলা এই গ্রামে এল, তখন সবাই তাকে ডাইনী ভাবল। চেহারাও হয়েছে ডাইনীর মতো। অনাহারে অনিদ্রায় পথশ্রমে শকুন্তলা বলে তাকে চেনা যাচ্ছিল না। পরিচয় না দিলে কেউই তাকে চিনতে পারত না। পরিচয় দিয়েই নিজের লাঞ্ছনা নল মাথা পেতে।

শকুন্তলার মৃত্যুটাও খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। মঠের ভিতর সে থাকতে চেয়েছিল। বলেছিল, ছেরিঙের এই সাধ ছিল। ছেরিঙ বড় লামা হলে সে সব মেয়েকেই পড়বার অধিকার দিত। মঠে থেকে পড়তে দিত তিব্বতের মেয়েকে। ছেরিঙ নাকি তাকে বলেছিল, কেউ তাদের ঠাঁই না দিলে তারা দুজনে মিলে মঠ গড়বে, নালন্দার মতো বিরাট বিহার! সেখানে সবার সমান অধিকার। ছেলে মেয়ে সবাই সেখানে অবাধে থাকবে, সব কিছু পড়বে। দেবতার দেওয়া অধিকার মানুষে কেড়ে নেবে, এ কিছুতেই তারা সহ্য করবে না। ছেরিঙ সহ্য করে নি, শকুন্তলাও

করবে না। সত্যিই শকুন্তলা তার সংকল্প রক্ষা করেছিল।

মেয়েটার মৃত্যুর খবর পুঁথিতে লেখা আছে। কারণটা লেখা নেই। সে কি তার শেষ অবস্থায় তিব্বতে পৌঁছেছিল। কিন্তু তেমন দুর্বল মেয়ে হলে সে যেত না। ছেরিঙের অসমাপ্ত কাজ নিয়েই গিয়েছিল, বাধা না পেলে সে হয়তো সেখানেও আন্দোলন করত। শকুন্তলা তার সুযোগ পায় নি। সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ তাকে সে সুযোগ দেয় নি।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, দাওয়া কষ্ট পাচ্ছে। বললাম: শকুন্তলাকেও কি লোকে খুন করেছিল?

ভারাক্রান্ত সুরে দাওয়া বলল: কী করে জানব বল!

তা ঠিক। কিন্তু তার সন্দেহের কথা সে প্রকাশ করে ফেলেছে। যেমন বলেছে ছেরিঙের গল্প। বললাম: আমার একটা আপত্তির কথা আছে।

কী কথা?

বললাম: নালন্দার সম্বন্ধে আমার খুব উঁচু ধারণা। সেখানে খুন-জখম যেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তেমনি মনে হয়েছে তোমার সুরা ও নারীর গল্প। এসব দুর্নীতি বোধ হয় ছিল না।

দাওয়া সে কথা মেনে নিল। বলল: বোধ হয় তাই। আমি তোমাকে গল্পের কথা বলছি, ইতিহাসের কথা নয়। তবে আমি মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কথা জানি। এ গল্প তাই অবিশ্বাস করি না।

বললাম: আমার আর একটা প্রশ্ন আছে। ইতিহাস আমি পড়ি নি। নালন্দায় কি সত্যিই স্ত্রীশিক্ষা ছিল না?

দাওয়া বলল: তুমি কোন ঐতিহাসিকের কাছে সে কথা জেনে নিও।

ধর্মশালায় আজ আমরা তাড়াতাড়ি ফিরলাম। রাজগীরে

ফিরবার ট্রেন ছিল। কিন্তু দাওয়া ছাড়ল না। বলল ঃ ছেরিঙের জিনিসগুলো দেখে যাও।

সেগুলো দেখবার ইচ্ছা আমারও ছিল। শুধু কৌতূহল, আর কিছু নয়। ওগুলো নিয়ে গবেষণা করি, এমন বিদ্যা আমার জানা নেই। আমার শখ জাদুঘরের জিনিস দেখার মতো। বললাম ঃ নিশ্চয়ই দেখব।

দাওয়া আগে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। ফিরে এলে বললাম ঃ তোমাদের মঠের লামারা তো লোক ভাল।

কেন বল তো ?

হঠাৎ এই মন্তব্য শুনে দাওয়া খুবই আশ্চর্য হয়েছিল।

বললাম ঃ ছেরিঙের জিনিসগুলো তো হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। এখন তার মূল্য কত! আমাদের দেশ হলে কিছুতেই হাতছাড়া করত না।

দাওয়া হেসে বলল ঃ কাঠখড় আমাকেও পোড়াতে হয়েছে।

বললাম ঃ এ দেশে কাঠখড়ে কিছু হবে না।

কেন হবে না! কাঠখড় ভাল যোগালে গোটা একটা রাজ্য কিনতে পাওয়া যায়। সভ্য হয়ে মানুষ স্বার্থ চিনেছে, সততা ছিল বর্বর যুগে।

এ কথায় আমি চমকে উঠলাম। মনে হল, এই উক্তিতে আমি দাওয়ার নতুন পরিচয় পেলাম। এই পৃথিবীকে সে চেনবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর মূল্য বদলাচ্ছে প্রতিদিন। তার নূতন মূল্যকে দাওয়া দেখতে পেয়েছে।

বললাম ঃ কই তোমার জিনিস ?

দাওয়া সযত্নে একটা বাক্স খুলল। তারপর বার করল সেই মূর্তিটা। অদ্ভুত সুন্দর ভঙ্গি। তর্জনী তুলে একটা মেয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সংকল্পের দৃঢ়তা সংহত হয়ে আছে সুন্দর ওষ্ঠাধরে। ভারতীয় মেয়ে শকুন্তলা, কালিদাসের

শকুন্তলার মতোই।

আমার দেখা হলে দাওয়া বলল ঃ নিচের নামটা দেখ।

পায়ের কাছে কয়েকটা আঁচড় দেখলাম।

দাওয়া বলল ঃ আঁচড় নয়, ও ছেরিঙের নাম। জাদুঘরের মূর্তিটিতেও কি এই নাম তুমি দেখ নি?

দেখেছি বইকি। কিন্তু পড়তে পারি নি। এখানেও পারছি না। তবে একই রকম লেখা বলে মনে হচ্ছে।

আর এই দাগ দেখ।

ঠিক মুখের কাছটায় একটা কালো দাগ। ঠিক কালো নয়, খয়েরিও নয়। কোনদিন রক্তের দাগ ছিল বলে কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না।

বললাম ঃ আশ্চর্য!

খুশী হয়ে দাওয়া বলল ঃ আমার গল্পের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তো? শকুন্তলার দুটো মূর্তি। একটা হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা আজ জাদুঘরে। আর একটা ছিল তার কাছে। তাতে রক্তের দাগ।

বললাম ঃ অক্ষরে অক্ষরে।

এইবারে জামাটি দেখ।

বলে একটি জামা বার করল। প্রচুর এসেন্স আর ন্যাপথলিনেও পুরনো ভ্যাপসা গন্ধ ঢাকা পড়ে নি। কিন্তু দাওয়ার সেদিকে লক্ষ্য নেই। আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই সেকেলে তিব্বতী জামাটি দেখতে লাগলাম।

দাওয়া একটা জায়গা দেখিয়ে বলল ঃ এই দাগটা দেখ।

অনেকখানি জায়গায় ছোপ পড়েছে। আমার মনে হল, সে দাগও বুকের কাছটায়। তাড়াতাড়ি বললাম ঃ জামাটা আমাকে পরিয়ে দেবে?

দাওয়া বিস্ময়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

অনুরোধ করলাম ঃ দাও না!

দাওয়া আর কোন প্রশ্ন করল না। সযত্নে জামাটি আমায় পরিয়ে দিল। আমি সেই পুতুলটি আমার বুকের উপর চেপে ধরলাম। বিস্ময়ে দাওয়া অভিভূত হল।

বললাম ঃ কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

প্রশ্ন শুনে দাওয়া চমকে উঠল। বলল ঃ সত্যিই তো!

এই দাগগুলো যদি তাজা হত, তা হলে সেই পুরনো ঘটনাটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠত। বুকে ছুরি বিঁধেছে, অজস্রভাবে রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে, ছেরিঙ তার পুতুলটি নিজের বুকের উপর চেপে ধরেছে

দাওয়া অভিভূত হয়ে আমাকে দেখছে।

কতদিনের পুরনো পোশাক। কী দিয়ে তৈরি করেছে তারাই জানে। আজকালকার জিনিস হলে বাক্সের ভিতরেই গলে যেত, পরবার সময় খুলে পড়ত খণ্ড খণ্ড হয়ে। কিন্তু এ পোশাক বাক্সের ভিতর গলে যায় নি, আমার গা থেকেও খুলে পড়ল না। দাওয়ার মতো আমিও খুব আশ্চর্য বোধ করছি।

ছেরিঙের পুঁথিখানা দেখতে বাকি ছিল। দাওয়া এইবারে সেইখানা বার করল। আমাদের দেশের পুঁথির মতো লাল শালু দিয়ে মোড়া নয়। একখণ্ড গরম কাপড় দিয়ে জড়ানো ছিল। নতুন কাপড়। মনে হল, দাওয়া নিজে এই কাপড়খানা দিয়ে বেঁধে এনেছে।

পুঁথিখানা না দেখলেও চলত। একেবারে জীর্ণ পুঁথি। অস্পষ্ট অক্ষর। পাতাগুলোর একটাও অক্ষত নেই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। লেখাগুলো পুঁথির লেখার মতো নয়। শ্লোক তো নয়ই, শ্লোকের মতো পংক্তি বাঁধাও নয়। মনে হয়, মনের আবেগে লেখা। স্বাধীন মনের স্বাক্ষর আছে পাতায়। এ বুঝি কোন স্বভাব-কবি মনের ভাবনাকে ধরে রেখেছে লেখনীর টানে।

আরও লক্ষ্য করলাম যে পুঁথির শেষের দিকে নানা হাতের লেখা আছে। ভাষা কতকটা এক রকম হলেও লেখবার ধরন অন্য

রকম। দাওয়া বোধ হয় ঠিকই বলেছে যে এই লেখাগুলো নাম গিয়েল গোম্পার লামাদের লেখা। এরাই হয়তো ছেরিঙের শেষ কথাটুকু লিখে গেছে। লিখে গেছে শকুন্তলার কথা।

দাওয়া আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই লক্ষ্য করছিল। বলল: কী ভাবছ বল তো?

বললাম: শকুন্তলার কথাই ভাবছি।

দাওয়ার কাছে আমার ভাবনার কথা বুঝি স্পষ্ট হল না। বলল: খুলে বল।

বললাম: শেষের কথাগুলি নিশ্চয়ই শকুন্তলার কথা।

ঠিক বলেছ।

শকুন্তলার কাহিনীও তা হলে শেষ হয়ে গেছে!

কী করে?

দাওয়া পিছিয়ে দাঁড়াল।

আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। এমন স্পষ্ট অথচ দৃঢ় প্রশ্ন তার মুখে আমি আগে শুনি নি। উত্তর না দিয়ে আমি তার দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

দাওয়া বলল: শকুন্তলার কাহিনী কখনও শেষ হতে পারে! তার কাহিনীর শুরু হল তো তার মৃত্যুর পরে! আজও কি আমরা সেই একই জায়গায় পড়ে নেই?

আজ দাওয়ার এ কোন্ রূপ আমি দেখছি! দাওয়া তার তর্জনী তুলেছে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সংকল্পের দৃঢ়তা সংহত হয়ে আছে তার সুন্দর ওষ্ঠাধরে। অদ্ভুত সুঠাম ভঙ্গি। তিব্বতী মেয়ে দাওয়াকে আজ ভারতীয় মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। কালিদাসের শকুন্তলার মতো সুন্দরী মেয়ে। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তার মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে মন আমার কিছুতেই পারল না।

দাওয়া লজ্জা পেল, বলল: ছি ছি, অমন করে তাকাচ্ছ কেন?

আমি একবার আমার হাতের পুতুলটার দিকে তাকালাম, আর একবার দাওয়ার দিকে। হেসে বললাম ঃ শকুন্তলাকে দেখছি।

দাওয়া নিজেকে সামলে নিয়েছে, বলল ঃ তবু ভাল। শকুন্তলা যে মরে নি, তা স্বীকার করলে।

বললাম ঃ শকুন্তলারা কোনদিন মরে না। যুগে যুগে তারা ঠিক কাজ করে যায়। এক যুগের শকুন্তলা আর এক যুগে জন্মায় দাওয়া নামে।

আমার পাশে বসে বলল ঃ তুমি পুনর্জন্ম বিশ্বাস কর ?

কেন বল তো ?

হঠাৎ এই প্রশ্নের কারণ আমি বুঝতে পারলাম না।

দাওয়া বলল ঃ এমনিই জানতে চাইছি।

প্রশ্ন যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। বললাম ঃ অনেকেই করেন। অন্তত আমাদের ধর্ম তাই বলে।

দাওয়া বলল ঃ সে তো আমাদেরও ধর্মের কথা। তালে লামার পুনর্জন্মের কথা বিশ্বাস করে না, এমন পাপী আমাদের দেশে নেই। কিন্তু আমি তোমার বিশ্বাসের কথা জানতে চাইছি।

বললাম ঃ এতদিন বিশ্বাস করি নি। কিন্তু আজ তাই ইচ্ছে করছে।

কেন ?

আজ যে চোখের সামনে অতীতকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি শকুন্তলার পুনর্জন্ম হয়েছে তার মৃত্যুর দেশে।

এই কথাটি কি ছেরিঙের বেলাতেও খাটে না ?

তার এই প্রশ্ন শুনে মনে হল, আজ এই মুহূর্তে তারও এই কথা মনে হয়েছে। এক সুরে বাঁধা হলে দুটো বীণায় নাকি একই সুর জাগে। দুটো মনেও। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

রসভঙ্গ করল ধর্মশালার একটা লোক। চা এনে হাজির করেছে। তাকে দেখে দাওয়া খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল ঃ ভয় নেই।

আমার নিজের লোক। একটুও নোংরামি পাবে না।

আমি আমার পোশাক খুলে ফেললাম। পাট করে দিলাম। দাওয়া একে একে তার সমস্ত জিনিস বাক্সে গুছিয়ে রাখল। অতীত হারিয়ে গেল। আবার আমরা চেতনার যুগে ফিরে এলাম।

॥ ষোল ॥

দাওয়ার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি যে এমন সহসা ঘটবে, তা ভাবতে পারি নি। দাওয়া নিজেও যে কল্পনা করে নি, তা তার কথাতেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। এক খণ্ড সাদা পাথর আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ভোরবেলায় হোটেলে নিজের ঘরে বসে সেই পাথর খুদে একটা মূর্তি গড়ার চেষ্টা করছিলাম। কোনদিকে খেয়াল ছিল না। দাওয়া এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, তাও জানতে পারি নি। চমকে উঠলাম তার কথা শুনে। বলল: এ কার মূর্তি গড়ছ? এ যে সেই দৃষ্টি, সেই ভঙ্গি!

অন্যমনস্ক ভাবে আমি বললাম: সেই দৃষ্টিভঙ্গি!

দৃষ্টিভঙ্গি কি আজও আমাদের বদলায় নি?

চমকে উঠে আমি বললাম: কী বললে?

দাওয়া একখানা চেয়ারে বসে বলল: থাক সে কথা।

তখনও সে আমাকে তার দুঃসংবাদ পরিবেশন করে নি। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে সে এসেছে কর্তব্য নিয়ে। পরিচয় দুদিনের হলেও যে তা নিবিড় হবার সুযোগ পেয়েছে। বিদায় না নিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। মনও তা চায় না। জোর করে চলে গেলে মনে একটা ক্ষত হয়ে থাকবে, একান্তে ব্যাথা করবে খচখচ করে, হয়তো রক্তক্ষরণ হবে। আমি ভেবেছিলাম, দাওয়া রাজগীর দেখতে এসেছে। দুজনে আজ এই জায়গাটা দেখব। বললাম: তুমি নিশ্চয়ই এ শহরটা দেখ নি!

দাওয়া শুধু হাসল। বড় বিষণ্ণ হাসি! কিন্তু তাকে এত বিষণ্ণ দেখাবে কেন? বললাম: তোমার কী হয়েছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাওয়া বলল: তোমার দেশ আমাকে

ছেড়ে যেতে হবে। তোমাদের সরকারের হুকুম। আজই আমায় দেশে ফিরতে হবে।

কিন্তু তোমাকে কেন যেতে হবে ?

সংক্ষেপে দাওয়া বলল ঃ আমার দুর্ভাগ্য।

আমি অনেকক্ষণ কোন কথা কইতে পারলাম না। চীন তিব্বত ও ভারতের মধ্যে একদিন মৈত্রীর বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। ভারতে অধ্যয়নের জন্য সেদিন চীনের মানুষ আসত তিব্বতের উপর দিয়ে। তিব্বতীরাও সঙ্গী হত। হিউএন চাঙ ফাহিয়েনরা এসেছেন, ছেরিঙ টাশির মতো সাধারণ মানুষও এসেছে। যত নাম আমাদের মনে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি নাম আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু ভারতবর্ষ কাউকে তাড়িয়ে দেয় নি। আজ দাওয়াকে কেন যেতে হবে!

সরকারের উত্তর আমি অনুমান করতে পারি। আজও তাঁরা বন্ধুতা রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু দেশে এই মিষ্টি মেয়েটি থাকলে বন্ধুতা ক্ষুণ্ণ হত, এ কথা মানতে আমার মন চাইল না।

দাওয়া বলল ঃ তুমি এখানে কতদিন থাকবে ?

এ কথার উত্তর দিতে আমাকে একটুও ভাবতে হল না। বললাম ঃ আর একদিনও না।

সে কি!

তপতীর কথা আমার মনে পড়ল। বললাম ঃ কলকাতার একটা মেয়ে আমায় ডাকছে। বড় অসহায় মেয়ে।

তপতীর গল্পটা তাকে বললাম।

দাওয়া গম্ভীর হয়ে গেল, বলল ঃ তোমরাও কি আমাদেরই মতো পিছিয়ে আছ ?

কী করব বল, পৃথিবীর মন যে এমনি পিছিয়ে আছে। সকলের সমান অধিকার বলে বারে বারে আমরা ঘোষণা করছি। কিন্তু ঘরের মেয়েদের বেলায় আমাদের তা মনে থাকে না। যুক্তির বেড়

মেরে পুরনো মনটাকে কিছুতেই ছোটানো যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে দাওয়া কথা বলল: আমার স্বপ্নের কথা তোমাকে বলি। আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি।

জীবনের সমস্ত কৌতূহল আমার অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে তবু বললাম: বল।

দাওয়া বলল: স্বপ্নে আমি জ্ঞানমিত্রকে দেখেছি। সে তার শ্লোকের অর্থ আমাকে বলে দিচ্ছে।

খানিকক্ষণ আগে হলেও আমি উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হয়ে উঠতাম। এখন শুধু নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকালাম।

দাওয়া বলল: জ্ঞানমিত্র বুঝিয়ে দিল যে ছেরিঙ টাশির একটা আদর্শ ছিল। সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিল এক লাফে তাইতেই তার পতন হল। পৃথিবীর রঙ একদিনে বদলায় না। অনেকে অনেক দিন ধরে চাইলে তবেই বদলায়।

তারপর?

আমি শকুন্তলার কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কিছু উত্তর পেলে?

না। ঘুম আমার ভেঙে গেল।

পৃথিবী বুঝি এখনও ঘুমচ্ছে।